ভূপাল রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভূপাল রহস্য

॥ এক ॥

কাকাবাবু দারুণ চটে গেলেন নিপুদার ওপর।

নিপুদা মানুষটি খুব আমুদে ধরনের, সব সময় বেশ একটা হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভালবাসেন, আর কথাও বলেন জোরে-জোরে।

নিপুদা আমার জামাইবাবুর ছোট ভাই। গত বছর আমার ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। ছোড়দি আর জামাইবাবুরা এখন থাকে মধ্যপ্রদেশের ভূপাল শহরে। নিপুদাও ভূপালেই পড়াশুনা করেছে, চাকরিও করে সেখানে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস।

অফিসের কাজে নিপুদাকে প্রায়ই আসতে হয় কলকাতায়। এসেই চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছটা বাংলা সিনেমা থিয়েটার দেখে ফেলে, আমাদের খাওয়াতে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রীটের ভাল ভাল হোটেলে। নিপুদা এলে আমাদের সময়টা বেশ ভালই কাটে।

কিন্তু নিপুদার কথা শুনে যে কাকাবাবু প্রথমেই এতটা চটে যাবেন, তা আমিও বুঝতে পারিনি।

কাকাবাবু নিজের ঘরে বসে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে কিছু একটা পুরনো দলিল পরীক্ষা করছিলেন। আর অন্যমনস্কভাবে পাকাচ্ছিলেন বাঁ দিকের গোঁফ। নিপুদা সে-ঘরে ঢুকেই কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। কাকাবাবু তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আরে, আরে ও কী, না, না, দরকার নেই।'

কাকাবাবু পছন্দ করেন না কেউ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করুক। কাকাবাবুর একটা পা অকেজো বলেই বোধহয় তাঁর বেশি সঙ্কোচ। নিপুদা তবু জোর করে প্রণাম সেরে নিয়ে বসল। তারপর বলল, 'কাকাবাবু, কেমন আছেন ? ওঃ, নেপালে তো আপনারা একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করে এলেন, পুরো একটা গুপ্তচর-চক্রকেই ধরে ফেললেন। ভূপালের কাগজেও খবরটা খুব বড় করে বেরিয়েছিল। আমরা অবশ্য ওখানে বোম্বের খবরের কাগজও পাই···প্রথমে ওরা খবর দিয়েছিল, আপনি বুঝি সেই অ্যাবোমিনেব্‌ল স্নোম্যান,

ইয়েতি যাকে বলে···তাই আবিষ্কার করে ফেলেছেন ! আচ্ছা কাকাবাবু, ইয়েতি বলে সত্যিই কি কিছু আছে ?'

কাকাবাবু মুখখানা একটু হাসি-হাসি করে বললেন, 'কী জানি !'

নিপুদা আবার বলল, 'আর ঐ যে লোকটা, কেইন শিপ্‌টন, ও কি পালিয়েই গেল ? ওকে আর ধরা গেল না ?'

কাকাবাবু 'দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'না !'

আমি বুঝতে পারলুম কাকাবাবু নিজের কোনও একটা চিন্তা নিয়ে মগ্ন আছেন, কথা বলার মুডে নেই।

নিপুদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু, আপনি কখনও ভূপাল গেছেন ? একবার চলুন না, দারুণ জায়গা, আপনার খুব ভাল লাগবে !'

কাকাবাবু বললেন, 'ভূপাল আমি গেছি। দুবার বোধহয়। না, তিনবার।'

নিপুদা তবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আর একবার চলুন। এবারেই আমার সঙ্গে চলুন, একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে !'

'এখন তো আমার যাওয়া হবে না। অন্য কাজে ব্যস্ত আছি।'

'জানেন, ভূপালে গত এক মাসের মধ্যে তিনটে সাঙ্ঘাতিক খুন হয়েছে। পুলিশ কিচ্ছু করতে পারছে না।'

এবার কাকাবাবু মুখ তুলে সোজা তাকালেন নিপুদার দিকে।

নিপুদা বলল, 'ওখানকার পুলিশগুলো কোনও কম্মের না। আপনি গেলে ঠিক খুনিকে খুঁজে বার করতে পারবেন। ওখানকার একজন পুলিশ অফিসারকে আমি বলেছি, তুমি মিঃ রায়চৌধুরীর নাম শুনেছ, তাঁকে ডেকে তাঁর বুদ্ধি নাও··· ।'

কাকাবাবুর চোখ দুটি স্থির, মুখখানা লাল হয়ে গেছে। তখনই আমি বুঝতে পেরেছি যে, কাকাবাবু বিরক্ত হয়েছেন। তাঁর অত রাগের কারণটা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম পরে। কাকাবাবু সাধারণ ডিটেকটিভ নন, খুনের তদন্ত করাও তাঁর পেশা নয়। কোনও বড় শিল্পীকে যদি সিনেমার পোস্টার আঁকতে বলা হয়, তা হলে তিনিও কাকাবাবুর মতনই চটে যাবেন নিশ্চয়ই।

রেগে গেলে কাকাবাবু বকাবকি, চ্যাঁচামেচি কিছুই করেন না, শুধু তাঁর মুখখানা কী রকম চৌকো মতন হয়ে যায়।

কাকাবাবু চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর নিপুদার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সব খবরটবর ভাল তো ? রুমি ভাল আছে নিশ্চয়ই ?'

নিপুদা তাও মহা উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, 'প্রথম খুনটার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় খুন···ডেড বডিটা পাওয়া গেল আরেরা কলোনিতে. একটা পার্কের মধ্যে···'

কাকাবাবু আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিপু, তুমি এখন ভেতরে

যাও; অন্যদের সঙ্গে কথা-টথা বলো—'

কাকাবাবু রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে পেছনের একটা দেয়াল-আলমারি খুলে বই ঘাঁটতে লাগলেন খুব মনোযোগ দিয়ে।

নিপুদা বলল, 'তারপর শুনুন, কাকাবাবু, থার্ড খুনটা…'

আমি এবার চুপিচুপি নিপুদাকে বললুম, 'চলো নিপুদা, আমরা ভেতরে যাই।'

নিপুদা কী রকম যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কী ব্যাপার, উনি আমার কথা শুনলেনই না!'

'কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছেন অন্য কিছু নিয়ে।'

'কিন্তু পরপর তিনটে নৃ-নৃ-নৃ, মানে ঐ যে কী যে বলে লোমহর্য খুন…হ্যাঁগো, সন্তু, এই লোমহর্য কথাটার মানে কী গো? হর্ষ মানে তো আনন্দ!'

আমি বললুম, 'লোমহর্য না, রোমহর্ষক। যা শুনলে ভয়ে সারা গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে।'

নিপুদা বলল, 'হ্যাঁ, সেই রকম ঘটনাই বটে। কাকাবাবু যদি কেসটা হাতে নেন, আমাদের মধ্যপ্রদেশে ওঁর খুব নাম হয়ে যাবে।'

'আমি কাকাবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। আগে তো আমায় বলতে হবে কেসটা। আমি যদি মনে করি নেওয়া যেতে পারে, তা হলে কাকাবাবুকে রাজি করাব।'

কিন্তু কাকাবাবুর সহকারী হিসেবে নিপুদা আমায় বিশেষ পাত্তা দিল না। ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কী বুঝবে! এমন নৃ-নৃপুংসক ব্যাপার!'

'নৃপুংসক? ওঃ হো, নৃশংস! আমি কত সাঙ্ঘাতিক নৃশংস ব্যাপার দেখেছি, তুমি ধারণাই করতে পারবে না! জানো, আন্দামানে কী হয়েছিল!'

নিপুদা বলল, 'চল, তা হলে আজ সন্ধেবেলা 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমাটা দেখে আসি।'

'তা তো যাব। খুন তিনটের কথা বলবে না?'

নিপুদা আমাদের বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও কে! তোমরা বাড়িতে নেপালি দারোয়ান রাখলে কবে?'

আমি বললুম, 'নেপালি দারোয়ান না তো! ও তো মিংমা, আমাদের বন্ধু। ওর জন্য কাকাবাবু আর আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। ও ক'দিন আগে নেপাল থেকে বেড়াতে এসেছে আমাদের এখানে।'

'তাই বলো। কী সুন্দর চেহারা ছেলেটির। খুব স্মার্ট, নয়?'

'মিংমা দু'বার এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিল।'

'ও, শেরপা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজন শেরপার নামও কাগজে বেরিয়েছিল বটে। এই-ই সেই? এ তো তা হলে খুব বিখ্যাত!'

মিংমা গেটের কাছে আমার কুকুরটাকে নিয়ে খেলছিল। এই প্রথমবার

কলকাতায় এসেছে মিংমা। কলকাতার রাস্তায় ও একা-একা বেরুতে ভয় পায়। তাই আমাদের সঙ্গে ছাড়া বাড়ির বাইরে বিশেষ কোথাও যায় না। আমার কুকুরটার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে। বেশ বাংলাও শিখে গেছে এর মধ্যে। শিস্ দিয়ে ডাকছে, 'র-কু-কু ! ইধার এসো ! দৌড়কে এসো।'

মিংমাকে ডেকে আমি আলাপ করিয়ে দিলুম নিপুদার সঙ্গে।

নিপুদা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তুম তো নেপালকা আদমি হ্যায়, ভূপাল কভি দেখা ? ভূপাল নেপালসে ভি আচ্ছা !'

মিংমা ভূপাল জায়গাটার নামই শোনেনি। সে অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে।

নিপুদা মিংমার বুকে টোকা মেরে বলল, 'তুম নেপালি, হাম ভূপালি ! তুম্ ভি হামলোগকা সাথ সিনেমা চলো।'

সন্ধেবেলা সিনেমা দেখার পরই অবশ্য আমাদের বাড়ি ফিরে আসতে হল, বাইরের হোটেলে আর খাওয়া হল না। কারণ মা আজকে তিন রকম মাছ রান্না করেছেন মিংমার জন্য। মিংমা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। বিশেষত ইলিশ আর চিংড়ি।

খাবার টেবিলে নানারকম গল্প-গুজব হচ্ছে, হঠাৎ নিপুদা দুম্ করে কাকাবাবুকে বলল, 'কাকাবাবু, আপনি ভূপালে গেলে খুব ভাল হত। আমি ধীরেনদাকে প্রায় কথাই দিয়ে ফেলেছি যে, আপনাকে এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

কাকাবাবু খাওয়া বন্ধ করে অকারণেই একবার বাঁ হাত দিয়ে গোঁফটা মুছে গম্ভীর গলায় বললেন, 'নিপু, আমি জানি না ধীরেনদাটি কে ? আর আমাকে জিজ্ঞেস না করে আমার সম্পর্কে কারুকে কথা দেওয়ার অভ্যেসটিও মোটেই ভাল নয়।'

এমন কী, মা পর্যন্ত বুঝতে পেরে গেলেন যে, কাকাবাবু খুবই রেগে গেছেন নিপুদার ঐ রকম কথা শুনে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, 'নিপু, তুমি আর একটা ইলিশ মাছ নাও। একটা পেটি নাও, তোমাদের ওখানে তো ইলিশ পাওয়া যায় না ! তোমরা চিংড়ি মাছ পাও ?'

নিপুদা মায়ের কথা গ্রাহ্য না করে আবার বলল, 'বুঝলেন না, তিন-তিনটে খুন, তিনজনই শিক্ষিত লোক, তাদের একেবারে গলা কেটে ফেলেছে। একটা ডেড বডি তো আমি নিজেই দেখেছি, ওঃ কী রক্ত !'

কাকাবাবু বললেন, 'খাওয়ার সময় ওসব রক্তারক্তির কথা বলতে নেই, তাতে হজমের গণ্ডগোল হয়। মন দিয়ে খেয়ে নাও বরং, বৌদি খুব সুন্দর রান্না করেছেন।'

কাকাবাবু নিজে আর বিশেষ কিছু খেলেন না। প্রায় তক্ষুনি উঠে পড়লেন। আমি শুনতে পেলাম কাকাবাবু ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে

দিচ্ছেন। অর্থাৎ এর পরেও যেন নিপুদা গিয়ে ওকে বিরক্ত করতে না পারে।

অবশ্য নিপুদার মুখে খুনের কথা শুনে আর সবাই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বাবা বললেন, 'তোমাদের ওখানেও খুন-জখম শুরু হয়ে গেছে নাকি ?'

মা বললেন, 'কোথাও আজকাল আর একটুও শান্তি নেই। খালি খুন আর খুন। তুমি নিজের চোখে দেখলে নিপু ? কী রকম দেখলে, গলা কাটা ?'

নিপুদা বলল, 'খুন তো সব জায়গাতেই হয়, কিন্তু এই খুনগুলো একদম অন্যরকম। তিন জনই নিরীহ ভদ্রলোক, লেখা-পড়ার চর্চা নিয়ে থাকতেন। একজন তো আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। ভদ্রলোকের নাম অর্জুন শ্রীবাস্তব, আমি কতদিন দেখেছি মাঝরাতের পরেও ওঁর ছাদের ঘরে আলো জ্বলছে। সারারাতও নাকি জেগে কাটাতেন মাঝে মাঝে। যেদিন ঘটনাটা ঘটল সেদিনও রাত দুটোর সময় নাকি পাড়ার একটি ছেলে ওঁর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছিল, আর ভোরবেলা দেখা গেল, পার্কে একটা বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে ওঁর দেহটা, আর মুণ্ডুটা গড়াচ্ছে ঘাসের ওপর।'

মা বললেন, 'উফ ! মানুষ, এত নিষ্ঠুর হয় !'

নিপুদা বলল, শ্রীবাস্তবজী অতি শান্তশিষ্ট মানুষ, পাড়ার কারুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাবও ছিল না, ঝগড়াও ছিল না, নিজের মনে থাকতেন। এ রকম লোককে কে যে মারবে...।'

আমি বললুম, 'নিপুদা, তুমি বারবার শুধু দ্বিতীয় খুনটার কথা বলছ কেন। প্রথম খুনটা কীভাবে হয়েছিল ?'

'দ্বিতীয় খুনটার পরই প্রথম খুনটার কথা ভালভাবে জানা গেল। খবরের কাগজে লিখল যে, অর্জুন শ্রীবাস্তবের মতনই ভূপাল মিউজিয়ামের কিউরেটর সুন্দরলাল বাজপেয়ীকেও কেউ ঐ রকমভাবে গলা কেটে খুন করেছে মাসখানেক আগে। তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছিল একটা কবরখানায়। সুন্দরলাল বাজপেয়ী অনেকদিন বিলেতে ছিলেন, খুব সাহেব ধরনের মানুষ, তাঁর চেহারাও ছিল বিশাল, ঐ রকম একজন তাগড়া লোকের গলা কেটে খুন করাও তো সহজ কথা নয়।'

'আর তৃতীয়টা ?'

'তৃতীয় ঘটনাটা একটু অন্যরকম। সেটা তো ঘটল আমি আসবার মাত্র চার দিন আগে। এঁর নাম মনোমোহন ঝাঁ। বেশ বয়স্ক লোক, চাকরি থেকে কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছিলেন। ইনি থাকতেন একা একটি ফ্ল্যাটে। সঙ্গে একজন চাকর। একদিন সকালে দেখা গেল ওঁর ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কেউ মনোমোহন ঝাঁকে খুন করে গেছে। তাঁর মুখের ওপর তখনও বালিশটা চাপা দেওয়া রয়েছে।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর সেই চাকরটা ?'

নিপুদা বলল, 'সবারই প্রথমে চাকরটার কথাই মনে হয়েছিল। পুলিশও ভেবেছিল, চাকরটাই খুন করে পালিয়েছে। যদিও ঘরের জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি, আর ঐ চাকরটিও নাকি মনোমোহন ঝাঁ-র কাছে কাজ করেছে প্রায় তিরিশ বছর ধরে। পরদিন চাকরটাকে পাওয়া গেল ভূপাল থেকে দশ মাইল দূরে এক মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায়, তার জিভটা কাটা।'

মা বললেন, 'অ্যাঁ ?'

'কেউ তার জিভটা কেটে নিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। বুঝলেন না, একেবারে লোমহর্ষক ব্যাপার! চাকরটার চিকিৎসা হচ্ছে হাসপাতালে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ!'

'তারপর কী হল ?'

'তারপর পুলিশ ভূপাল শহর একেবারে তোলপাড় করে ফেলেছে। কিন্তু কে বা কারা যে এমন খুন করে চলেছে, তার কোনও হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না।'

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'রুমিরা বেশি রাত্তির করে আবার বেড়াতে-টেড়াতে যায় না তো ?'

নিপুদা বলল, 'থার্ড খুনটা হওয়ার পর অনেকেই বেশ ভয় পেয়ে গেছে। একটু রাত্তির হলেই রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানেন, যে তিনজন খুন হয়েছে, তাদের কারুর বাড়ি থেকেই কোনও জিনিসপত্র বা টাকাকড়ি খোয়া যায়নি। মনে হয় কোনও পাগলের কাণ্ড।'

বাবা বললেন, 'সাধারণ পাগল হলে কি আর এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে ? পাগল-টাগল নয়, তোমাদের মধ্যপ্রদেশে তো অনেক বড় বড় ডাকাতের গ্যাং আছে।'

নিপুদা বলল, 'ডাকাতরা নিরীহ সাধারণ লোকদের মারে না, আর তারা শহরেও আসে না। এই খুনের উদ্দেশ্যটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

মা বললেন, 'হাত শুকনো হয়ে যাচ্ছে, এবার তোমরা উঠে পড়ো। হাত ধুয়ে নাও।'

নিপুদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'চল সন্তু, আমার সঙ্গে ভূপাল যাবি নাকি ?'

নিপুদা জিজ্ঞেস করার আগেই আমি সব ঠিক করে ফেলেছি অনেকটা। আমার এখন ছুটি। অনায়াসেই ছোড়দির বাড়িতে কিছুদিন থেকে আসতে পারি। খালি একটা ব্যাপার আছে। আমি জানি, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের রহস্য সমাধান করার জন্য যে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন বসেছে, তাতে কাকাবাবুকে সদস্য করা হয়েছে। সানফ্রানসিসকো আর বারমুডার মাঝখানে সমুদ্রের একটা জায়গায় বড় বড় জাহাজ হঠাৎ ডুবে যায়। এমন কী, আকাশ থেকে অনেক এরোপ্লেনকেও যেন চুম্বকের মতো টেনে নেয়। কত যে এইভাবে ডুবেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই তদন্ত কমিশনের কাজ শুরু করার জন্য কাকাবাবু নেমন্তন্ন

পেয়েছেন আমেরিকা থেকে। কিন্তু কাকাবাবু লিখে জানিয়েছেন যে, তিনি কমিশনের সদস্য হতে আগ্রহী নন। তাঁকে যদি কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে তিনি একাই ঐ রহস্য সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে পারেন।

কাকাবাবুর এই চিঠির উত্তর এখনও আসেনি। যদি ওরা রাজি হয়, তাহলে কাকাবাবু তো আর একদম একা যাবেন না, নিশ্চয়ই আমাকেও নিয়ে যাবেন। ভূপাল গেলে যদি সেটা ফস্কে যায় ?

অবশ্য আমেরিকা যেতে হলেও তো কাকাবাবু এক্ষুনি যাচ্ছেন না। অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে এখানে। এর মধ্যে আট-দশ দিনের জন্য আমি ভূপাল থেকে ঘুরে আসতে পারি। নিশ্চয়ই কাকাবাবু আমাকে ফেলে চলে যাবেন না। এর আগে সব কটি অভিযানে আমি কাকাবাবুর সঙ্গে গেছি।

নিপুদার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম, 'হ্যাঁ, যাব !'

মিংমা এতক্ষণ মুখ নিচু করে মাছের কাঁটা বেছে খেয়ে যাচ্ছিল, এবার মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললুম, 'মিংমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। ওর বেশ বেড়ানো হবে।'

মা বললেন, 'না, না, এখন ভূপাল যেতে হবে না। খুনে গুণ্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে !'

নিপুদা হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি ? আমরা তো রয়েছি। আমাদের বাড়িতে লাইসেন্সড বন্দুক আছে, আজেবাজে লোক আমাদের বাড়ির ধার ঘেঁষতে সাহস করে না।'

বাবা বললেন, 'যাক্ না, ঘুরে আসুক না, এখন তো ছুটি রয়েছে।'

পরদিন সকালে আমি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু, আমি কি নিপুদার সঙ্গে ভূপাল যাব ক'দিনের জন্য ? খুব করে বলছেন…'

কাকাবাবু আজও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস নিয়ে পুরনো কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও, ঘুরে এসো ! কবে যাচ্ছ ? আজই ?'

মনে হল, যেন আমরা আজকে গেলেই কাকাবাবু খুশি হন। তাহলে নিপুদা আর ওঁকে বিরক্ত করতে পারবে না।

'হ্যাঁ, আজকেই রাত্তিরের ট্রেনে। মিংমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব ?'

এবার একটু ভেবে কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। মিংমাও ঘুরে আসুক। তবে ঐসব খুন-টুনের ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না !'

॥ দুই ॥

মধ্যপ্রদেশের নাম শুনলেই আমার মনে পড়ে শুধু জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়ের কথা। এছাড়া যেন ওখানে আর কিছু নেই। আমাদের চিড়িয়াখানায় যে সাদা বাঘ, তাও তো প্রথম এসেছিল ঐ মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল থেকে।

কিন্তু ভূপাল রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে খানিকটা আসবার পর আমি অবাক। এমন সুন্দর শহর আছে এই মধ্যপ্রদেশে! দারুণ দারুণ চওড়া রাস্তা, পরিষ্কার ঝকঝকে। দু পাশে নতুন ডিজাইনের নানা রকম বাড়ি। শহরের মাঝখানে একটা বিশাল লেক, তার ওপাশে পুরনো শহর। একটা মস্ত বড় মসজিদের চূড়া দেখতে পাওয়া যায় অনেক দূর থেকে। নিপুদার মুখে শুনলাম, বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় নবাব পতৌদির বাড়ি আছে ওখানে। ঠিক করলুম, একদিন পতৌদির সঙ্গে দেখা করে ওঁর অটোগ্রাফ নিতে হবে।

শহরটা ঠিক সমতল নয়, রাস্তাগুলো উঁচুনিচু। পাহাড় কেটে যে শহরটা বানানো হয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। এক এক জায়গায় বাড়িগুলো বেশ উঁচুতে। যেদিকেই তাকাই, চোখে বেশ আরাম লাগে।

ট্যাক্সিটা প্রায় সারা শহরটা পেরিয়ে এসে ঢুকল আরেরা কলোনিতে। এখানকার বাড়িঘরগুলো যেন আরও বেশি কায়দার যেন কার বাড়ি কত সুন্দর হবে এই নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গেই একটা করে বাগান। ইংরেজি সিনেমায় যে রকম বাড়ি-টাড়ি দেখি, সে তো এই রকমই।

একটা পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিপুদা বলল, 'এই পার্কেই পাওয়া গিয়েছিল সেকেণ্ড ডেড বডিটা।'

ডান দিকে হাত তুলে একটা হালকা নীল রঙের তিনতলা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'আর ঐ বাড়িতে থাকতেন অর্জুন শ্রীবাস্তব। ঐ যে ছাদের ঘরটা দেখতে পাচ্ছিস, ঐটাই ছিল ওঁর পড়ার ঘর।'

এর পর ট্যাক্সিটা ডান দিকে ঘুরতেই আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলুম।

ছোড়দি তো আমায় দেখে অবাক! আগে থেকে আমরা কোনও খবরও দিইনি। আমায় জড়িয়ে ধরে ছোড়দি বলল, 'খুব ভাল সময়ে এসেছিস রে সন্তু! আমরা এই শনিবারই পাঁচমারি যাবার প্ল্যান করেছি। দেখবি, দারুণ ভাল লাগবে।'

আমি মিংমার সঙ্গে ছোড়দির আলাপ করিয়ে দিলুম। মিংমা এমনিতেই কম কথা বলে, নতুন জায়গায় এসে একদম চুপ।

ছোড়দি মিংমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বা, ছেলেটির চেহারা খুব সুন্দর তো!'

আমি বললুম, 'ছেলেটা বলছ কী। ওর বয়েস একত্রিশ বছর, তোমার চেয়েও বয়েসে বড়। আর ও বাংলা বোঝে!'

ছোড়দি বলল, 'চট করে হাত মুখ ধুয়ে নে। তোদের খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

সত্যিই বেশ খিদে পেয়েছে। ভূপালে কলকাতা থেকে একটানা ট্রেনে আসা যায় না। নাগপুর থেকে বদল করতে হয়। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল, চলেছি তো চলেইছি, রাস্তা আর ফুরোচ্ছে না।

প্রথমে টপাটপ মিষ্টি খেয়ে ফেললুম কয়েকটা। তারপর ছোড়দি প্লেটে করে লুচি এনে দিল।

এ বাড়িটা দোতলা। ওপরে বেশ চওড়া বারান্দা, সেখানেই বসে গল্প করতে লাগলুম। বিকেল পেরিয়ে সবে মাত্র সন্ধে হব-হব সময়। আকাশে ঘুরছে কালো কালো মেঘ। রত্নেশদা এখনও অফিস থেকে ফেরেননি। নিপুদাও আমাদের পৌঁছে দিয়েই ছুটেছে নিজের অফিসের দিকে।

ছোড়দিদের বাড়ির সামনেও একটা বেশ সাজানো বাগান। সেখানে লাফালাফি করছে মোটকা-সোটকা খুব লোমওয়ালা একটা কুকুর। একটু দূরে আর একটা বাড়িতে একটা কুকুর অনবরত ডেকে চলেছে। আমরা আসার পর থেকেই ঐ কুকুরটার ঐ রকম একটানা ডাক শুনতে পাচ্ছি।

ছোড়দিই এক সময় বলল, 'ইশ্, ধীরেনদাদের কী অবস্থা! সর্বক্ষণ ঐ রকম কুকুরের ডাক সহ্য করা...'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কুকুরটার কী হয়েছে? পাগল হয়ে গেছে নাকি?'

'না। ঐ কুকুরটা ছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব নামে এক ভদ্রলোকের। তিনি হঠাৎ মারা গেছেন কিছুদিন আগে। তারপর থেকেই কুকুরটা ঐ রকম ডেকে চলেছে। মনিবের জন্য ও কাঁদে।'

'কিন্তু অর্জুন শ্রীবাস্তবের বাড়ি তো এই ডানদিকে, আর কুকুরটা ডাকছে এদিকের একটা বাড়ি থেকে।'

ছোড়দি একটু অবাক হয়ে তাকাল, আমার দিকে। তারপর বলল, 'ও, নিপু বুঝি এর মধ্যেই তোদের সব বলেছে? শ্রীবাস্তবজী মারা যাবার পর কুকুরটাকে দেখাশুনো করবার কেউ ছিল না, উনি তো একলাই কুকুরটাকে নিয়ে থাকতেন— সেই জন্য ধীরেনদা নিজের বাড়িতে কুকুরটাকে নিয়ে এসেছেন।'

'ধীরেনদা কে?'

'নিপু তোদের ধীরেনদার কথা কিছু বলেনি?'

'নামটা শুনেছি একবার।'

'সন্ধেবেলা তোদের নিয়ে যাব ধীরেনদাদের বাড়িতে।'

কুকুরটা তখনও ডেকেই চলেছে। কী রকম যেন অদ্ভুত করুণ সুর। আমার মনে পড়ল, সেই নেপালের অভিযানে কেইন শিপ্‌টনেরও একটা সাদা লোমওয়ালা সুন্দর কুকুর ছিল। কেইন শিপটন পালাবার পর সেই কুকুরটাও এরকম একা-একা কাঁদত। কেউ খাবার দিলে খেতে চাইত না। শেষ পর্যন্ত কুকুরটা যে কার কাছে রইল কে জানে!

সন্ধেবেলা সবাই মিলে যাওয়া হল ধীরেনদার বাড়িতে। ধীরেনদা মানে ধীরেন চক্রবর্তী, একটা বিদেশি কোম্পানির বিরাট একটা কারখানার উনি ম্যানেজার। মানুষটি কিন্তু খুব হাসিখুশি। এখানকার অনেক বাঙালিই আসে এঁর বাড়িতে আড্ডা দিতে। সবাই ওঁকে ডাকে ধীরেনদা আর ওঁর স্ত্রীকে বলে

রিনাদি।

ছোড়দি আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর ধীরেনদা বললেন, 'আরে, তাই নাকি ? এই তাহলে 'পাহাড়চূড়ায় আতঙ্কের' সেই হীরো সন্তু, আর এই সেই মিংমা ? আজ তো দু'জন খুব বিখ্যাত মানুষ এসেছে আমাদের বাড়িতে। কাকাবাবু এলেন না ? ইশ, কাকাবাবুকে একবার দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল !'

ধীরেনদাদের দুটি ছেলে, দীপু আর আলো। এদের মধ্যে দীপু প্রায় আমারই বয়েসি !

রিনাদি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সন্তু, তোমরা যে সিয়াংবোচিতে ছিলে, এভারেস্টের অত কাছে, সেখানে তোমাদের নিশ্বাসের কষ্ট হয়নি ?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, প্রথম-প্রথম দু' একদিন হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে অক্সিজেন মাস্ক-ও ছিল, কিন্তু পরে সেগুলোর দরকার হয়নি, এমনিই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।'

ধীরেনদা বললেন, 'পাহাড়চূড়ায় আতঙ্কের হীরোরা এসেছে, আজ ওদের মাগুর মাছ খাওয়াব !'

কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলুম। মাগুর মাছ খাওয়ার মধ্যে আবার এমন কী বিশেষত্ব আছে ?

ধীরেনদা বললেন, 'দীপু, আলো, চলো আমরা এখন মাছ ধরব।'

সবাই মিলে চলে এলুম বাগানে। প্রথমে মনে হয়েছিল কোনও পুকুরে বুঝি

মাছ ধরতে যাওয়া হবে। তা নয়। বাগানের এক কোণে রয়েছে একটা বেশ বড় চৌবাচ্চার মতন। পাশাপাশি চারখানা ক্যারাম বোর্ড সাজিয়ে রাখলে যত বড় হয়, ততখানি। কালো মিশমিশে জল, ওপরে ভাসছে পদ্মপাতা, দুটো পদ্মফুলও ফুটে আছে।

দুটো ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটের মতন হাত-জাল নিয়ে ধীরেনদা আর দীপু সেই জলের মধ্যে মাছ খুঁজতে লাগল। এক সময় দীপুর জাল থেকে একটা কী যেন লাফিয়ে পড়ল আমাদের সামনে।

প্রথমে চমকে উঠে আমি ভেবেছিলাম ওটা বুঝি সাপ ! এত বড় মাগুর মাছ কখনও দেখিনি, প্রায় এক হাত লম্বা আর অ্যাত্ত বড় মাথা !

ছোড়দি ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে বলল, 'ধীরেনদা এই মাগুর মাছ সহজে তুলতে চান না। এখানে তো মাগুর মাছ পাওয়া যায় না। তোদের বেশি খাতির করার জন্যই ধরলেন।

চৌবাচ্চাটায় নিশ্চয়ই অনেক মাছ কিলবিল করছে, কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ধীরেনদা আর দীপু সাত-আটটা মাছ তুলে ফেলল।

রিনাদি বললেন, 'আর দরকার নেই, সাতটা মাছ থাক, একটাকে জলে ছেড়ে দাও।'

বাগানের অন্যদিকে অর্জুন শ্রীবাস্তবের কুকুরটা ডেকেই চলেছে। একটা

খুঁটির সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা। মিংমা মাছ ধরা না দেখে সেই কুকুরটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধীরেনদা চেঁচিয়ে বললেন, 'ওর গায়ে হাত মাত দেও। কামড়ে দিতে পারে।'

কুকুরটা খয়েরি, খুব বেশি বড় নয়, কিন্তু গলার আওয়াজ বেশ জোরালো। মিংমা কুকুর খুব ভালবাসে। কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে লক্ষ করল একটুক্ষণ। তারপর খপ্ করে এমন কায়দায় ওর ঘাড়টা এক হাতে চেপে ধরল যে কুকুরটার কামড়াবার কোনও সাধ্য রইল না।

অন্য হাত দিয়ে মিংমা কুকুরটার লোমের ভেতর থেকে পোকা বাছতে লাগল। বড় বড় এঁটুলি।

কুকুরটা ডাক থামিয়ে দিয়েছে। মনে হল যেন বেশ আরাম পাচ্ছে।

ধীরেনদা বললেন, 'এই মিংমার তো বেশ এলেম আছে। কুকুরটাকে এ পর্যন্ত কেউ সামলাতে সাহস পায়নি।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা ধীরেনদা, অর্জুন শ্রীবাস্তবের ঘরটা একবার দেখতে পারি? ঘরটা কি বন্ধ আছে?"

ধীরেনদা বললেন, 'কেন, তুমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করবে নাকি? বেশ তো!'

ছোড়দি বলল, 'না, না, সন্তুর ও-সবে মাথা গলাবার দরকার নেই। মা আমাকে চিঠি লিখে বারণ করে দিয়েছেন। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলেও না হয় আলাদা কথা ছিল!'

ধীরেনদা বললেন, 'কাকাবাবু নেই বটে, কিন্তু আমরা তো আছি। সন্তুর অভিজ্ঞতা আছে, সেই সঙ্গে যদি আমরাও সাহায্য করি, তা হলে হয়তো খুনিকে ধরে ফেলা যেতে পারে। মধ্যপ্রদেশের সরকার এর মধ্যেই দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।'

আমার অবশ্য খুনের তদন্ত করার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। কাকাবাবুর সঙ্গে আমি যে-সব অ্যাডভেঞ্চারে গেছি, তা আরও অনেক বড় ব্যাপার। তবু চুপ করে রইলুম।

ধীরেনদা বললেন, 'চাবি আমার কাছেই আছে। চলো, এখুনি ঘুরে আসি!'

ধীরেনদা, আমি, দীপু আর মিংমা বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়। মিংমা কুকুরটাকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। তিনতলার ওপর শুধু দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট আর ছাদ। অর্জুন শ্রীবাস্তব সেখানে একাই থাকতেন। সেখানে গিয়ে অবশ্য চমকপ্রদ কিছুই চোখে পড়ল না। দুখানা ঘরেই ঠাসা বইপত্র, প্রায় সব বইই ইতিহাস বিষয়ে। মনে হয় যেন বই ছাড়া অর্জুন শ্রীবাস্তবের আর কোনও সম্পত্তি ছিল না। কোথাও মারামারি, ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই নেই। দুটো বাক্স আর একটা আলমারি আছে, সেগুলোরও তালা ভাঙা হয়নি। চাবিও

পাওয়া গিয়েছিল, পুলিশ এসে খুলে দেখেছিল যে, ভেতরে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি কেউ।

ধীরেনদা বললেন, 'পার্কে অর্জুন শ্রীবাস্তবের দেহ যদিও পাওয়া গিয়েছিল ভোরবেলা, কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেছে যে, তাঁকে খুন করা হয়েছিল রাত একটা দেড়টার সময়।'

অত রাতে শ্রীবাস্তবজি কি নিজেই পার্কে গিয়েছিলেন ? না চেনা কেউ তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ?

কুকুরটা এখানে এসেই আবার চ্যাঁচাতে শুরু করেছে। ও নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। কিন্তু আমরা যে ওর ভাষা বুঝি না !

শার্লক হোম্‌সের মতন একটা পোড়া দেশলাই-কাঠি কিংবা এক টুক্‌রো কাপড়ের মতন কোনও সূত্রই চোখে পড়ল না। তবু আমি উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলুম খাটের তলা-টলা।

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে, সন্তু, কিছু বুঝতে পারলে ?'

আমি চুপ করে রইলুম। অনেক বইতেই পড়েছি, বড়-বড় ডিটেকটিভরা কোনও সূত্র বা প্রমাণ পেলেও প্রথম দিকটায় কিছুই বলতে চান না।

আমার একবার মনে হল, কাকাবাবু এখানে উপস্থিত থাকলে কী করতেন ? তিনি কোন্ কোন্ জিনিস পরীক্ষা করতেন আগে ? হয়তো তিনি এই বইগুলোই পড়তে শুরু করে দিতেন।

অর্জুন শ্রীবাস্তবের বিছানাটা এখনও একইরকমভাবে পাতা আছে। চাদরে কোনও ভাঁজ নেই, মনে হয় রাতে শ্রীবাস্তবজি শুতেই যাননি। বিছানাটার দিকে তাকাতেই আমার গা শিরশির করছে। এই বিছানায় কয়েকদিন আগেও একজন মানুষ শুয়েছে, আজ সে বেঁচে নেই !

ধীরেনদা বললেন, 'শ্রীবাস্তবজি ছিলেন আমার বন্ধু। অতি নিরীহ, শান্ত মানুষ, তাঁকে যে কেউ ওরকম ভয়ঙ্করভাবে খুন করতে পারে বিশ্বাসই করা যায় না।'

খানিক বাদে আমরা চলে এলুম সেখান থেকে।

তারপর ধীরেনদার বাড়িতে থাকা হল অনেক রাত পর্যন্ত। গল্প হল অনেক রকম। আমরা এই শনিবারই পাঁচমারি বেড়াতে যাচ্ছি শুনে ধীরেনদা বললেন, 'ইশ, আমরাও আর একটা গাড়ি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে গেলে পারতুম। কিন্তু শনিবার তো হবে না, সেদিনই আমাদের কোম্পানির এক সাহেব আসছে আমেরিকা থেকে।'

ছোড়দি বলল, 'একটু চেষ্টা করে দেখুন না, ধীরেনদা, কোনও রকমে ম্যানেজ করতে পারেন না ? আপনি গেলে খুবই ভাল হত !'

ধীরেনদা বললেন, 'কোনও উপায় নেই ! ঠিক আছে, তোমরা পাঁচমারি থেকে ঘুরে এসো, তারপর আমি তোমাদের আর একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

ছোড়দি বলল, 'কোথায় ? সাঁচি ?'

'সাঁচি তো আছেই। সেখানে যে-কোনও দিন যাওয়া যেতে পারে। আমি তোমাদের নিয়ে যাব ভীমবেঠকায়।'

'ভীমবেঠকায় ? সেটা আবার কোন্ জায়গা ?'

'নাম শোনোনি তো ? যারা ভূপাল বেড়াতে আসে, তারা সবাই সাঁচি স্তূপ দেখে কিংবা পাঁচমারি যায়। কিন্তু আমার মতে ভীমবেঠকাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জায়গা। তোমাদের মতন যারা ভূপালে এসে বেশ কিছুদিন আছে, তারাও ঐ জায়গাটার নাম শোনেনি !'

রিনাদি বললেন, 'ঐ ভীমবেঠকা তোদের ধীরেনদার খুব ফেভারিট জায়গা। অবশ্য গেলে তোদেরও খুব ভাল লাগবে। ঐ অর্জুন শ্রীবাস্তবই আমাদের প্রথম ভীমবেঠকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তার আগে আমরাও নাম জানতুম না।'

ভীমবেঠকা নামটা শুনে আমারও কী রকম অদ্ভুত লাগল। ঐ রকম কোনও জায়গার নাম শুনলেই যেতে ইচ্ছে করে।

যাই হোক, আগে তো পাঁচমারি ঘুরে আসা যাক।

পরের দিন নিপুদা আমাদের গাড়ি করে ভূপালের বিখ্যাত লেক দেখিয়ে আনল। নবাব পতৌদির বাড়িতেও গেলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলুম, পতৌদি এখন ভূপালে নেই, অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলা দেখতে গেছেন।

শনিবার সকালে পাঁচমারি যাবার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। রত্নেশদা একটা বড় স্টেশন ওয়াগান জোগাড় করে এনেছেন, আমরা সবাই তো যাবই, ধীরেনদার ছেলে দীপুও যাবে আমাদের সঙ্গে। এর মধ্যে দীপুর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে।

একে-একে সব জিনিস-পত্র তোলা হচ্ছে। পাঁচমারিতে নাকি রাত্রে খুব শীত পড়ে, তাই নিতে হচ্ছে কম্বল-টম্বল। রত্নেশদা সঙ্গে নিলেন একটা শট্‌গান্, যদি শিকার-টিকার কিছু করা যায়। আগেই শুনেছিলুম, পাঁচমারি যাবার পথে বাঘ দেখা যেতে পারে।

নিপুদা একটা ছোট্ট রেডিও এনে বলল, 'এটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই, কী বলো ? ওখানে গিয়ে গান-টান শোনা যাবে।'

রেডিওর ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য নিপুদা একবার ওটা চালাল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুনতে পেলুম একটা দারুণ দুঃসংবাদ !

রেডিওতে তখন স্থানীয় খবর শোনাচ্ছে। তাতে জানা গেল যে, বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ভূপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনাকে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছোড়দি বলল, 'অ্যাঁ ? কী সর্বনাশ !'

রত্নেশদা বলল, 'চুপ করো ! আগে শুনতে দাও পুরো খবরটা !'

আরও জানা গেল যে, ডঃ শাকসেনা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য জেনিভা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পরশু রাত্রে ফিরেছেন ভূপালে। রাত্রে তিনি যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন, সকালবেলা থেকে তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে তিনি কিছু বলে যাননি, এমনভাবে তাঁর হঠাৎ উধাও হয়ে যাবার কোনও কারণই নেই। এর আগে যে তিনটি বীভৎস হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার জের টেনে ডঃ শাকসেনা সম্পর্কেও চরম আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ সারা মধ্যপ্রদেশ জুড়ে তল্লাশি শুরু করেছে এবং দিল্লিতে সি বি আই-কেও জানানো হয়েছে।

নিপুদা বলল, 'এই রে, আর দেখতে হবে না ! ওঁকেও মেরেছে।'

ছোড়দি বলল, 'চুপ করো ! আগে থেকেই এরকম বলতে শুরু কোরো না। এখনও তো কিছু পাওয়া যায়নি।'

নিপুদা বলল, 'ওঁর মতন একজন শিক্ষিত, বয়স্ক লোক কারুকে কিছু না বলেই বাড়ি থেকে চলে যাবেন, এ কি হয় ? এ নিশ্চয়ই গুম খুনের কেস।'

রত্নেশ বলল, 'আমাদের অফিসের ঐ যে বিজয় শাকসেনা, তার তো আপন কাকা হন ইনি। একদিন বিজয়ের বাড়িতে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এমন সৌম্য চেহারা যে, দেখলেই ভক্তি হয়। ঐ রকম মানুষের যে কোনও শত্রু থাকতে পারে, তাই তো বিশ্বাস করা যায় না।'

নিপুদা বলল, 'এখন হোল্ ইণ্ডিয়াতে ডঃ শাকসেনার মতন ইতিহাসের এত বড় পণ্ডিত আর কেউ নেই। এত জায়গা থেকে ওঁকে চাকরি দেবার জন্য সেধেছে ! কিন্তু উনি ভূপাল ছেড়ে কোথাও যেতে চান না।'

এই সময় এসে পড়ল খবরের কাগজ। তাতেও প্রথম পাতাতে ডঃ শাকসেনার ছবি দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে খবর বেরিয়েছে।

ছোড়দি আর নিপুদা কাগজটা আগে পড়বার জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। রত্নেশদা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, এখন নয়, আগে গাড়িতে উঠে পড়ো, যেতে-যেতে পড়বে ! অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

একটু বাদেই আমাদের গাড়ি ছুটল পাঁচমারির দিকে।

॥ তিন ॥

পাঁচমারি যে এতটা দূরে, তা আগে বুঝতে পারিনি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, তার মধ্যে কত রকম জায়গা যে পেরিয়ে এলুম তার ঠিক নেই। ধুধু-করা মাঠ, ছোট ছোট শহর, কোথাও ঘন জঙ্গল। এক জায়গায় তো গাড়ি থেকে নেমে আমাদের সবাইকে হাঁটতে হল, সেখানে একটা নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, কিছুটা জায়গা বালির ওপর দিয়ে যেতে হয়, ভর্তি গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, খালি গাড়িটা কোনওরকমে হেলেদুলে গিয়ে উঠল ব্রিজে।

শেষের দিকে বেশ খানিকটা একেবারে পাহাড়ি রাস্তা। গাড়িটা উঠতে লাগল ঘুরে-ঘুরে। এক পাশে ঘন বন, আর একদিকে বহুদূর ছড়ানো উপত্যকা। অনেকটা আমাদের দার্জিলিং-এর মতন। গাড়ি চালাচ্ছে নিপুদা, আর রত্নেশদা রাইফেলটা ধরে বসে আছে জানলার ধারে। খুব আশা করেছিলুম দু-একটা বাঘ-ভালুক দেখতে পাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা লুকিয়েই থেকে গেল।

পাঁচমারি শহরটা প্রথম দেখে এমন কিছু নতুন মনে হয় না। মনে হয়, এমনিই পাহাড়ের ওপর একটা ছোট্ট শহর। কিন্তু কিছুক্ষণ থাকবার পর বোঝা যায়, এ-রকম জায়গা আমাদের দেশে বিশেষ নেই। ঠিক যেন ছবির বইতে কিংবা সিনেমায় দেখা ইওরোপের কোনও গ্রাম। সাহেবরাই এই পাহাড়ের ওপর জায়গাটা পরিষ্কার করে এক-সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বানিয়েছিল। সাহেবি ধরনের সব বাড়ি, সেই রকম ছোট্ট গির্জা। আমাদের দার্জিলিংও সাহেবদের তৈরি, কিন্তু এখন সেখানে অনেক নতুন বাড়ি-ঘর উঠেছে। কিন্তু সাহেবরা চলে যাবার পর পাঁচমারিতে আর তেমন নতুন বাড়িঘর বানাতে দেওয়া হয়নি, তাই শহরটাকে দেখতে ঠিক আগেকার মতনই আছে।

আমাদের হোটেলটা একটা টিলার ওপরে। এটাও আগে ছিল আগেকার এক সাহেবের। প্রত্যেক ঘরে ফায়ারপ্লেস। এখানকার বারান্দায় দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। ডানদিকে একটা উঁচু পাহাড়ে মন্দির। পাহাড়টা একেবারে খাড়া। ঐ মন্দিরে মানুষ যায় কী করে কে জানে!

পাহাড়ি জায়গায় এসে মিংমা খুব খুশি। ও কথা খুব কম বলে, কিন্তু মুখচোখ দেখলেই বোঝা যায়, এখানে এসে ওর খুব আনন্দ হয়েছে। হোটেলের পেছন দিকটায় একটা আমলকী গাছ, মিংমা সেটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে অনেক আমলকী পেড়ে ফেলল। প্রায় দু' কিলো হবে! আমলকী খাবার পর জল খেলে খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু এত আমলকী কে খাবে?

হোটেলে সব গুছিয়ে রাখার পর আমরা আবার বেরিয়ে পড়লুম। পাঁচমারিতে অনেক কিছু দেখবার আছে। মনে হয়, এই জায়গাটা শিবঠাকুরের খুব পছন্দ। এক জায়গায় পাথরের গায়ে এমনি-এমনি ফুটে উঠেছে ত্রিশূলধারী শিবের ছবি। পাঁচমারি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে রয়েছে একটা শিবলিঙ্গ, সেটা ওখানে কেউ বসায়নি। তৈরি হয়েছে স্বাভাবিকভাবে।

আর-একটা ছোট টিলার ওপরে রয়েছে পাশাপাশি কয়েকটা গুহা। দেখলে মনে হয়, বহুকাল আগে কেউ ওখানে একটা বাংলো বানিয়েছিল। আমরা ওপরে উঠে দেখলুম, গুহাগুলো ঠিক ঘরের মতন। একজন গাইড বলল, এটা পঞ্চ-পাণ্ডবের গুহা। বনবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী এখানে কিছুদিন ছিলেন।

এই পাণ্ডবগুহার আবার ছাদ আছে। সেখানে এসে দেখলুম, একজন মানুষ পা ঝুলিয়ে বসে আছে এক ধারে। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিমে একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে, লোকটি চেয়ে আছে সেদিকে।

রত্নেশদা বলে উঠল, 'আরে, বিজয়!'

লোকটি চমকে আমাদের দিকে ফিরল। নাকের নীচে পাকানো গোঁফ, ভালমানুষের মতন চেহারা। কিন্তু মুখখানা গম্ভীর।

রত্নেশদা আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ হচ্ছে বিজয় শাকসেনা, আমার অফিসের কলিগ।'

ছোড়দি বিজয় শাকসেনাকে আগে থেকেই চেনে, সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কবে এসেছেন?'

বিজয় শাকসেনা হিন্দিতে উত্তর দিল, 'আজই দুপুরে। চীফ মিনিস্টার কয়েকদিন পর এখানে মীটিং করতে আসবেন, সেই ব্যবস্থা করতে এসেছি।'

রত্নেশদা বলল, 'হঠাৎ ঠিক হল বুঝি! কিসে এলে? আমাদের বললে পারতে, আমাদের গাড়িতে অনেক জায়গা ছিল—'

বিজয় শাকসেনা বলল, 'একটা জিপ পেয়ে গেলাম। কোনও অসুবিধে হয়নি।'

নিপুদা বলল, 'আপনার আংকল ডক্টর শাকসেনার কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে?'

বিজয় অবাক হয়ে বলল, 'কেন, একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমার কাকা তো বিদেশে!'

'সে কী, আপনি শোনেননি! উনি ফিরে এসেছেন, তারপরই আবার উধাও হয়ে গেছেন, ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ সকালে রেডিওতে বলেছে, কাগজেও বড় করে বেরিয়েছে...'

'ও, আমি ভোর চারটেয় বেরিয়েছি। রেডিও শুনিনি, কাগজও দেখিনি। কী বলছেন, উনি হারিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ, উনি রহস্যময়ভাবে নিরুদ্দেশ। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, ওঁকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।'

'বাড়ি থেকে?'

'হ্যাঁ। উনি শুতে গিয়েছিলেন...'

'অসম্ভব! বাড়ি থেকে কে ওঁকে নিয়ে যাবে? উনি খেয়ালি লোক, হঠাৎ মাথায় কিছু এসেছে, নিজেই কোথাও চলে গেছেন। আমার কাকিমা কী বলেন জানেন? উনি বললেন যে, ওঁর বয়েস যদি এক হাজার বছর হত, তা হলে ভাল হত। কারণ অন্তত এক হাজার বছরের পুরনো না হলে...কোনও কিছু সম্পর্কে আমার কাকার কোনও আগ্রহ নেই। নিশ্চয়ই এখন উনি কোনও ধ্বংসস্তূপের

মধ্যে বসে আছেন !'

'না, মানে, সবাই ভয় পাচ্ছে, ভূপালে হঠাৎ যে-সব খুন-টুন হতে শুরু করেছে...'

'আমার কাকাকে কে খুন করবে ? কেন খুন করবে ? না, না, না, আপনারা শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন। চলুন নীচে যাওয়া যাক। এরপর অন্ধকার হয়ে যাবে।'

নীচে নামার পর বিজয় শাকসেনা আর বিশেষ কিছু না বলে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।

রত্নেশদা বলল, 'চলো সবাই, এক্ষুনি হোটেলে ফিরতে হবে। পাঁচমারির ব্যাপার জানো তো, একটু রাত হলে আর বাইরে থাকা যায় না।'

আমি ভাবলুম, রাত্তিরবেলা বোধহয় এখানে বাঘ বেরোয়।

তা নয়, বাঘের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক এখানকার শীত। এটাই পাঁচমারির বিশেষত্ব। দিনের বেলা এখানে গরম জামা গায়ে দিতেই হয় না। কিন্তু যেই সন্ধের পর অন্ধকার নামতে শুরু করে, অমনি আরম্ভ হয় শীত। সে কী সাঙ্ঘাতিক শীত ! হোটেলে ফিরতে না-ফিরতেই আমরা কাঁপতে লাগলুম ঠকঠক করে।

তাড়াতাড়ি রাত্তিরের খাওয়া সেরে নিয়ে আমরা সবাই মিলে একটা ঘরে বসলুম আড্ডা দিতে। অনেক কাঠ এনে ফায়ারপ্লেস জ্বালানো হয়েছে, তবু শীত

যায় না। আমরা আগুনের কাছে এসে মাঝে-মাঝে হাত-পা সেঁকে নিচ্ছি। আমরা যে কম্বল এনেছি, তাতে কুলোবে না, হোটেল থেকে আরও কম্বল দিয়েছে। একজন বেয়ারা বলেছে যে, প্রত্যেকের অন্তত তিনটে করে কম্বল লাগবে।

নিপুদা একসময় রত্নেশদাকে বলল, 'আচ্ছা, দাদা, তোমার অফিসের ঐ বিজয় শাকসেনার ব্যবহারটা কেমন একটু অস্বাভাবিক লাগল না ?'

ছোড়দি বলল, 'আমার মনে হল, ভদ্রলোক আমাদের দেখে যেন একটু চমকে উঠলেন। আমরা যে এই শনিবার পাঁচমারিতে আসব, তুমি অফিসে জানাওনি ?'

রত্নেশদা বলল, 'হ্যাঁ, জানাব না কেন ? বিজয়কেও তো বলেছিলাম। বিজয়ও যে এখানে আসবে, সেটা জানতুম না। অবশ্য চীফ মিনিস্টারের এখানে আসবার কথা আছে ঠিকই।'

আমি বললুম, 'ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনার নিরুদ্দেশ হবার কথা উনি আমাদের কাছে প্রথম শুনলেন ?'

রত্নেশদা বলল, 'ও যে বলল আজ খুব ভোরে বেরিয়েছে। রেডিও শোনেনি, কাগজও পড়েনি। তাহলে জানবে কী করে ?'

আমি বললুম, 'রেড়িওতে আজ সকালে জানালেও ডক্টর শাকসেনাকে

পাওয়া যাচ্ছে না কাল সকাল থেকে। কাল সারা দিনে উনি কোনও খবর পাননি ? ওঁরা এক বাড়িতে থাকেন না বুঝি ?'

রত্নেশদা বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। এক বাড়িতে না থাকলেও খুব কাছাকাছি বাড়ি। বিজয়ের কাকার বাড়ি থেকে দেখা যায়। ও-বাড়িতে কিছু হলে বিজয় নিশ্চয়ই জানবে !'

নিপুদা বলল, 'আমাদের মুখে খবরটা শুনেও ওকে খুব একটা ব্যস্ত হতে দেখলুম না। ওদের কাকা-ভাইপোতে ঝগড়া নাকি ?'

রত্নেশদা বলল, 'আরে না, না। বিজয় ওর কাকাকে একেবারে দেবতার মতন শ্রদ্ধা করে। তা ছাড়া বিজয় মানুষটা খুব ভাল। কারুর সঙ্গেই ওর ঝগড়াঝাঁটি নেই।'

দীপু বলল, 'আমি একটা কথা বলব ? আমার কী মনে হচ্ছে জানেন ? চিরঞ্জীব শাকসেনাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে, তা ঐ বিজয়বাবু জানেন ! তারা বিজয়বাবুকে ভয় দেখিয়েছে যে, মুখ খুললেই মেরে ফেলবে। সেইজন্যই উনি পাঁচমারিতে পালিয়ে এসেছেন।

ছোড়দি বলল, 'দীপু ঠিকই বলেছে, আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।'

রত্নেশদা বলল, 'ওর কাকার এত বড় বিপদ হলে বিজয় নিজের প্রাণের ভয়ে চুপ করে থাকবে, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ও হয়তো সত্যিই খবরটা জানত না। কাল সারাদিন বোধহয় ব্যস্ত ছিল... আরে তাই তো, বিজয় তো গতকাল অফিসেও আসেনি।'

নিপুদা বলল, 'উনি পাঁচমারিতে কোথায় উঠেছেন, সে-কথাও তো আমাদের বললেন না। হঠাৎ চলে গেলেন।'

রত্নেশদা বলল, 'পাঁচমারি ছোট জায়গা, সবার সঙ্গে সবার রোজ দেখা হয়। বিজয় নিশ্চয়ই সার্কিট হাউসে উঠেছে। কাল সকালেই আবার দেখা হবে।'

একটু বাদেই পরপর দুবার দুড়ুম দুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল ! আমরা চমকে উঠলুম !

জায়গাটা এমনই শান্ত আর নিস্তব্ধ যে, সেই আওয়াজ যেন কামানের গর্জনের মতন শোনাল।

শীত অগ্রাহ্য করেও আমরা চলে এলুম বারান্দায়। এই টিলার ওপর থেকে পাঁচমারির অন্য বাড়িগুলোর আলো একটু-একটু দেখা যায়। যেন ছড়ানো-ছেটানো অনেকগুলো তারা। দূরে কোথাও সামান্য গোলমালের আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। এত রাতে কে বন্দুক ছুঁড়বে ? জঙ্গলে কেউ শিকার করতে গেছে ? এই শীতের মধ্যেও যদি কেউ শিকারে যায়, তবে তার শখকে ধন্য বলতে হবে !

আর বেশিক্ষণ আমাদের গল্প জমল না। সকলের মন টানছিল বিছানার দিকে। শোওয়ামাত্র ঘুম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখন ন'টা বেজে গেছে। চারদিকে ঝলমল করছে রোদ। শীতও অনেক কম।

হোটেলের লম্বা টানা বারান্দায় অনেকগুলো বেতের চেয়ার আর টেবিল। আমরা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে চা খেতে লাগলুম। মিংমা চা খেল পরপর চার কাপ। ছোড়দির এই শীতে সর্দি লেগে গেছে, 'হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো' করছে বারবার।

কয়েকজন বেয়ারা এক কোণে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল গতকাল রাত্রের সেই গুলির আওয়াজের কথা। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'রত্নেশদা, কালকের সেই গুলি—'

রত্নেশদা বলল, 'ও হ্যাঁ, তাই তো!'

একজন বেয়ারাকে ডেকে রত্নেশদা জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাত্রে কিসের শব্দ হয়েছিল? তোমরা শুনেছ?'

বেয়ারাটি বলল, 'সাব, এমন কাণ্ড এখানে কোনওদিন হয়নি। পাঁচমারিতে বেশি লোক আসে না, যারা আসে তারা সব বাছাই-বাছাই মানুষ। এখানে কোনওদিন কোনও হাঙ্গামা-হুজ্জোত হয় না। এই প্রথম এখানে এমন একটা খারাপ ব্যাপার হল—'

'কী হয়েছে, আগে তাই বলো না!'

'সার্কিট হাউসে কারা এসে কাল এক বাবুকে গুলি করেছে।'

রত্নেশদা চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? সার্কিট হাউসে? কে গুলি করেছে? কাকে করেছে? কেউ মারা গেছে?'

বেয়ারাটি অত খবর জানে না। সে সব শুনেছে অন্য লোকের মুখে। একদল ডাকাত নাকি এসেছিল, একজন না দুজন মরে গেছে। ডাকাতরা অনেক কিছু নিয়ে গেছে।

ব্রেকফাস্ট না খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি। ছোড়দি আর মিমোকে রেখে যাওয়া হল।

সার্কিট হাউসের সামনে তখনও কুড়ি-পঁচিশ জন লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। আমরা পৌঁছে বুঝলুম, আমাদের ঠিক পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। একটুর জন্য দেখা হল না।

কাল রাত্রে কেউ এসে গুলি ছুঁড়েছে ঠিকই। কেন ছুঁড়েছে বা কে ছুঁড়েছে তা বোঝা যায়নি। গুলির শব্দ শুনে সার্কিট হাউসের অন্য বাসিন্দারা উঠে এসে দেখে যে, বারান্দায় একজন লোক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তখনও মরেনি, অজ্ঞান। এখানকার হেল্‌থ সেন্টারে একজন মাত্র ডাক্তার, তিনি আবার কাল বিকেলেই চলে গেছেন জব্বলপুরে। তখন অন্যরা কোনও রকমে আহত লোকটিকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। গুলি লেগেছে উরুতে। আজ সকালে এই পাঁচ মিনিট আগে লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল শহরের হাসপাতালে। সঙ্গে

সার্কিট হাউস থেকেও দুজন গেছেন।

একটু খোঁজ করতেই জানা গেল, আহত লোকটির নাম বিজয় শাকসেনা।

॥ চার ॥

পাঁচমারিতে আমাদের থাকার কথা ছিল চার-পাঁচ দিন। কিন্তু আমরা ফিরে এলুম দু' দিনের মধ্যেই। এত ভাল জায়গা, তবু আমাদের মন টিকছিল না। সেই গুলি চলবার পর টুরিস্টরা অনেকেই ফিরে গেল। জায়গাটা এমনিতেই ফাঁকা, এখন যেন একেবারে শুনশান। আমরা অবশ্য সেজন্য কিংবা ভয় পেয়ে ফিরিনি। ফিরতে হল ছোড়দির জন্য। ছোড়দির সর্দিটা খুব বেড়ে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ফিরে এসেই রত্নেশদা খবর নিল। বিজয় শাকসেনা এখানকার কোনও হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। অফিসেও কোনও খবর আসেনি।

আর ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা এখনও নিরুদ্দেশ। অবশ্য তাঁর মৃতদেহের সন্ধানও পাওয়া যায়নি।

রত্নেশদা বলল, 'ভূপাল অনেক দূর। পাঁচমারি থেকে কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে নিশ্চয়ই। অফিস থেকে তার খোঁজে চারদিকে খবর পাঠানো হয়েছে।'

এর পর আরও তিনদিন কেটে গেল, এর মধ্যে আর নতুন কোনও খবর

নেই। আমি এখানে এসেই কাকাবাবুকে একটা চিঠি লিখেছিলুম, তার কোনও জবাব পাইনি। কিন্তু মা'র কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে, মা লিখেছেন তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যেতে। কাকাবাবুর আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হল কি না তা জানা গেল না।

এর মধ্যে একদিন ধীরেনদা এসে বললেন, 'চলো সন্তুবাবু, এবারে তোমাদের একদিন ভীমবেঠকা দেখিয়ে নিয়ে আসি! সাঁচিও তো দেখোনি! চলো, চলো, কালকেই ভীমবেঠকা ঘুরে আসি। তারপর একদিন সাঁচি দেখে নিও।'

দীপ্ত বলল, 'বাবা, আমরা বেশ খাবার-দাবার নিয়ে যাব। ভীমবেঠকায় পিকনিক করা যাবে।'

আমি দীপ্তকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি ভীমবেঠকায় গেছ?'

দীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, দু'বার!'

'কী আছে সেখানে?'

দীপ্ত কিছু বলার আগেই ধীরেনদা বললেন, 'এখন বলিস না রে, দীপ্ত! ওটা সারপ্রাইজ থাক!'

রত্নেশদা আর নিপুদার অসুখ, ওরা যেতে পারবে না।

ছোড়দিরও সর্দি। সুতরাং রিনাদি আর ধীরেনদা, দীপ্ত আর আলো, আমি আর মিংমা, এই ক'জন গেলুম পরদিন। বেরিয়ে পড়লুম সকাল দশটার

মধ্যে।

প্রথমে পাঁচমারির দিকেই খানিকটা যাবার পর এক জায়গায় আমরা বেঁকে গেলুম ডান দিকে। তারপর রাস্তাটা ক্রমশ একটু-একটু উঁচুতে উঠতে লাগল। অথচ সামনের দিকে ঠিক যে কোনও পাহাড় আছে, তা বোঝা যায় না। আরও খানিকটা যাবার পর চোখে পড়ল, রাস্তার এক পাশে রয়েছে অনেক বড়-বড় পাথরের চাঁই। কিছুক্ষণ চলার পর ধীরেনদা একটা গাছের তলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'এই হল ভীমবেঠ্‌কা!'

আমি ধীরেনদা আর রিনাদির মুখের দিকে তাকালুম। সারপ্রাইজ দেবার নাম করে কি আমাকে ঠকাতে নিয়ে এলেন এখানে? এ আবার কী জায়গা? একটা টিলার ওপরে কতকগুলো দোতলা-তিনতলার সমান পাথর পড়ে আছে। জায়গাটা সুন্দর নয়, তা বলছি না, বেশ নিরিবিলি, পিকনিক করার পক্ষে ভালই। কিন্তু যে-কোনও পাহাড়ি জায়গাতেই তো একরকম দেখা যায়। দূরে কোথাও যাবার সময় রাস্তার ধারে এরকম কত জায়গা চোখে পড়ে। আমি হিমালয়ের কত চূড়া দেখেছি, এভারেস্টের কাছাকাছি থেকে এসেছি, আমাকে ধীরেনদা এই কয়েকটা পাথর দেখিয়ে অবাক করতে চান?

ধীরেনদা বললেন, 'ভীমবেঠ্‌কার আসল নাম কী জানো? ভীমবৈঠ্‌ক। মহাভারতের ভীম নাকি এখানে বসে আড্ডা দিতেন। বোধহয় হিড়িম্বার সঙ্গে!'

পেল্লায় আকারের পাথরের চাঁইগুলোর চেহারায় খানিকটা ভীম-ভীম ভাব আছে বটে। কিন্তু এরকম গল্পও তো আগে অনেক জায়গায় গিয়ে শুনেছি।

ধীরেনদা আবার বললেন, 'এখন জায়গাটা অবশ্য ভীমের জন্য বিখ্যাত নয়। শোনো, সন্তু, এরকম জায়গা কিন্তু সারা পৃথিবীতেই খুব কম আছে। তোমার কাকাবাবু এলে এ জায়গাটা খুবই পছন্দ করতেন।'

সারা পৃথিবীতে খুব কম আছে? ধীরেনদা এখনও আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন? এরকম ছোট পাহাড়ি জায়গা আমি নিজেই অন্তত একশোটা দেখেছি! রিনাদি আর দীপুরা মিটিমিটি হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

ধীরেনদা বললেন, 'বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, মনে হয় খুব সাধারণ জায়গা, তাই না? সেটাই এর মজা। একটু ভেতরে ঢুকলেই বুঝতে পারবে আসল ব্যাপার। চলো!'

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, সামনের দিকে একটা বড় পাথরের গায়ে একটি আশ্রম। সেখানে দু' তিনজন এমনি লোক, একজন সাধু, একটা গোরু আর একটা কুকুর রয়েছে, আর এই দিনের বেলাতেও ধুনির আগুন জ্বলছে। ভারতবর্ষে বোধহয় এমন কোনও পাহাড় নেই, যার চূড়ায় কোনও মন্দির বা সাধুর আশ্রম নেই।

ধীরেনদা চুপি-চুপি বললেন, 'যখনই এই সাধুর আশ্রমটা দেখি, তখনই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। বুঝলে, একটা বেশ বড় গুহার মুখটি জুড়ে ঐ

আশ্রম। ঐ গুহার মধ্যে যে কী অমূল্য সম্পদ ঐ সাধুবাবাটি নষ্ট করছেন, তা উনি নিজেই জানেন না! চলো, আমরা ডান দিকে যাব।'

বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোকে এক-একটা আলাদা পাহাড় বলেও মনে করা যায়, আর সেগুলোর মাঝখান দিয়ে বেশ গলির মতন যাতায়াতের জায়গাও রয়েছে। একটা সেইরকম পাথরের সামনে এসে ধীরেনদা থামলেন। এই পাথরটার গড়নটা একটু অদ্ভুত। মাঝখান থেকে অনেকটা যেন কেউ কেটে নিয়ে একটা বারান্দার মতন বানিয়েছে। মাথার ওপর ছাউনি-দেয়া বারান্দা, ভেতরে গিয়ে বসাও যায়। কেউ বানায়নি অবশ্য, এমনিই পাথরটা ঐ রকম।

ধীরেনদা বললেন, 'ধরো, এখন যদি খুব বৃষ্টি নামে, তাহলে আমরা সবাই মিলে এখানে আশ্রয় নিতে পারি, তাই তো? এক লক্ষ বছর আগেও আমাদেরই মতন কোনও মানুষ ঐ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল।'

'এক লক্ষ বছর আগে?'

'প্রমাণ চাও? ঐ দ্যাখো!'

ধীরেনদা আঙুল দিয়ে পাথরের দেয়ালে একটা জায়গায় কী যেন দেখাতে চাইলেন। প্রথমে আমার চোখেই পড়ল না। তারপর দেখলুম দেয়ালের গায়ে একটা হাতির ছবি। ছ' সাত বছরের বাচ্চারা যে-রকম আঁকে। অনেকটা এই ছবির মতন।

ধীরেনদা বললেন, 'এই ছবিটা অন্তত পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছরের আগেকার আঁকা।'

আমি বললুম, 'ধীরেনদা, আপনি আমাকে বড্ড বেশি ছেলেমানুষ ভাবছেন! আমি জানি, ঐ ছবিটা আপনি নিজেই আগে একদিন এসে এঁকে রেখে গেছেন!'

ধীরেনদা, রিনাদি সবাই হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

রিনাদি বললেন, 'আগেরবার সমরেশদা এসেও প্রথমে এই কথা বলেছিলেন না?'

ধীরেনদা বললেন, 'এই রকম জায়গাকে বলে রক শেলটার। সত্যিই আদিমকালের মানুষরা এখানে ছিল। এরকম একটা নয়, অন্তত একশো কুড়ি-তিরিশটা রক শেলটার আছে এই জায়গায়। চলো তোমায় দেখাব, আদিম মানুষের আঁকা এরকম হাজার-হাজার ছবি আছে। একসঙ্গে এত রক শেলটার, বললুম না, সারা পৃথিবীতে এরকম জায়গা খুব কম আছে!'

'কিন্তু এই ছবিটা যে অত পুরনো, তা বুঝব কী করে?'

'বড়-বড় ঐতিহাসিকরা এইসব ছবি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। রেডিও কার্বন টেস্টে যে-কোনও জিনিসের বয়েস বার করা যায়। দীপু, তুই যা তো, সন্তুকে এবার বোর্ডটা পড়িয়ে নিয়ে আয়। আগে ইচ্ছে করে তোমায় ওটা দেখাইনি।'

দীপু আমাকে আবার নিয়ে এল রাস্তার ধারে। সেখানে একটা বড় নীল

রঙের বোর্ড রয়েছে, তাতে সাদা অক্ষরে অনেক কথা লেখা। আমাদের দেশে সব ঐতিহাসিক জায়গাতেই পুরাতত্ত্ববিভাগ এরকম বোর্ড লাগিয়ে রাখে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, ধীরেনদা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না। সেই বোর্ডে লেখা আছে যে, ১৯৫৮ সালে ভি এস ওয়াকানকার নামে একজন ঐতিহাসিক এই জায়গাটা আবিষ্কার করেছেন। বেশিদিন আগের তো কথা নয়। তার আগে এই জায়গাটার কথা কেউ জানতই না? বোর্ডে আরও লিখেছে যে, এত বেশি প্রাগৈতিহাসিক ছবি ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। এখানে প্রস্তর যুগের গোড়ার দিক থেকে (অর্থাৎ ১০০,০০০ বছর আগে) প্রস্তর যুগের শেষ পর্যন্ত (১০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগে) একটানা মনুষ্য-বসবাসের চিহ্ন আছে তাদের তৈরি পাথরের কুঠার আর অন্যান্য জিনিসপত্তরও (মাইক্রোলিথিক টুলস) পাওয়া গেছে। আরও কী সব মেসোলিথিক, চালকোলিথিক যুগের কথা লেখা, তার মানে আমি বুঝতে পারলুম না, কাকাবাবু থাকলে বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

এখানকার এইসব গুহাতে সম্রাট অশোক কিংবা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় পর্যন্তও মানুষ ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারপর এই জায়গাটার কথা সবাই ভুলে যায়। এখন আবার এক সাধুবাবাজি একটা গুহায় থাকছেন। সুতরাং এখনও এখানে সেই আদিম মানুষদের বংশধর রয়ে গেছে, তা বলা যায়।

বোর্ডটা পড়বার পর খানিকক্ষণ আমি হতবাক হয়ে রইলুম। এক লক্ষ বছর! আমি যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এইখানে এক লক্ষ বছর আগে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে? লোহার মতন শক্ত তাদের শরীর, হাতে পাথরের হাতুড়ি, তারা দাঁতালো হাতি আর অতিকায় বাঘ-ভাল্লুক-গণ্ডারের সঙ্গে লড়াই করেছে।

দীপু বলল, 'এমন-এমন সব গুহা আছে, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। মনে হবে সব তৈরি করা। কিন্তু কোনওটাই তৈরি করা নয়। চলো, আগে তোমায় থিয়েটার হলটা দেখাই।'

গিয়ে দেখলুম, ধীরেনদারা সেখানেই বসে আছেন। সত্যিই জায়গাটা ছোট-খাটো একটা থিয়েটার হলের মতন। বেশ চওড়া, চৌকামতন জায়গা, ওপরটা ঢাকা, একদিকে বেদীর মতন। দেখলে অবশ্য বোঝা যায়, কোনও মানুষ এটা তৈরি করেনি, প্রাকৃতির হাতে গড়া।

ধীরেনদা বললেন, 'তখনকার লোকেরা থিয়েটার করতে জানত কি না তা অবশ্য আমরা জানি না। কিন্তু অনেকে নিশ্চয়ই এখানে ঘুমোত। কী চমৎকার জায়গা বলো তো, বাইরে যতই ঝড়-বৃষ্টি হোক, গায়ে লাগবে না! বাইরের দিকটায় নিশ্চয়ই কয়েকজন সারা রাত জেগে পাহারা দিত, যাতে হিংস্র কোনও জন্তু এসে ঢুকে না পড়ে। আমার ইচ্ছে করে, বাড়িঘর ছেড়ে আমিও এরকম

জায়গায় থাকি !'

রিনাদি বললেন, 'থাকলেই পারো। বেশ চাকরি-বাকরি করতে হবে না, কোনও চিন্তা থাকবে না।'

আলো বলল, 'বেশ পড়াশুনোও করতে হবে না ! ইস্কুলে যেতে হবে না।'

ধীরেনদা বললেন, 'কিন্তু খাব কী ? সেই সময়কার লোকেরা হরিণ, শুয়োর, খরগোশ এই সব মেরে খেত। এখন তো আর সেসব পাওয়া যায় না। এখনকার দিনে গুহায় থাকতে হলে সাধু সাজতে হয়।'

দীপু বলল, "বাবা, এখনও এখানে হরিণ আছে। আমি আগের বার এসে নীচের দিকের গুহাগুলোর কাছে হরিণের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম। টাট্‌কা।'

রিনাদি বললেন, 'হরিণ না ছাই ! নিশ্চয়ই ছাগলের পায়ের ছাপ। নীচের গ্রাম থেকে এখানে রাখালরা গোরু-ছাগল চরাতে আসে।'

ধীরেনদা বললেন, 'এখানকার দেয়ালের গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। সেইজন্যই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানেও ছবি আছে। চলো, অন্য গুহায় যাই, পরিষ্কার ছবি দেখতে পাওয়া যাবে।'

এর পরের গুহাটা আবার অন্যরকম। সামনের দিকটা ছোট। মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়, কিন্তু ভেতরটা ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে। একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। ধীরেনদা টর্চ জ্বেলে বললেন, 'এই দ্যাখো।'

এবার দেখলুম, মাথার ওপরের পাথরে এক সারি মানুষ আঁকা। এই রকম

ছবিগুলির রং গেরুয়া ধরনের। ঐ রঙের কোনও পাথর ঘষে ঘষে আঁকা।

রিনাদি বললেন, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ, সব ছবি এক রকম নয়।...এরই মধ্যে দু' একজন যেন নাচছে মনে হচ্ছে, তাই না ? ওরা নিশ্চয়ই নাচতেও জানত।'

দীপু বলল, 'নাচতে তো সবাই জানে, মা ! ধেই-ধেই করে লাফালেই নাচ হয়।'

আলো মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, ওরা এরকম বাচ্চাদের মতন ছবি আঁকত কেন ?'

রিনাদি বললেন, 'এক লক্ষ বছর আগেকার মানুষ। তারা তো মনের দিক থেকে বাচ্চাই ছিল। ছবি আঁকার কথা যে চিন্তা করেছে, এটাই যথেষ্ট নয় ?'

ধীরেনদা বললেন, 'আমরা প্রথমবার যেবার এসেছিলাম, সে-কথা মনে আছে, রিনা ? কী ভয় পেয়েছিলুম ! এই গুহাটাতেই তো, না ?'

রিনাদি বললেন, 'হ্যাঁ, এটাতেই। সেবার কী হয়েছিল জানো, সন্তু ? সেবার দীপু আর আলো আসেনি। আমি আর তোমাদের ধীরেনদা গুঁড়ি মেরে এই গুহাটাতে ঢুকে টর্চ জ্বেলেছি, দেখি যে এক কোণে একটা মানুষ বসে। আমি তো ভয় পেয়ে এমন চিৎকার করে উঠেছিলুম।'

ধীরেনদা হাসতে-হাসতে বললেন, 'শুধু চিৎকার ! তুমি এমন লাফিয়ে উঠলে

যে, ছাদে তোমার মাথা ঠুকে গেল।'

রিনাদি বললেন, 'আহা, তুমি ভয় পাওনি?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও একটু-একটু ভয় পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু চ্যাঁচাইনি। তারপর সেই মানুষটা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। সে কে জানো? ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা! উনি এই সব ছবির ফটোগ্রাফ তুলছিলেন, সেই সময় ওঁর ক্যামেরার ফ্লাশটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

রিনাদি বললেন, 'ডক্টর শাকসেনা তো এখানে বোধহয় প্রত্যেকদিন আসতেন। আমরা যতবার এসেছি, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

আমি বললুম, 'ডক্টর শাকসেনাকে পাওয়া যাচ্ছে না···উনি এরকম কোনও গুহার মধ্যে লুকিয়ে নেই তো?'

ধীরেনদা বললেন, 'ওঁর এখানকার সব ছবি তোলা হয়ে গেছে। চলো, এখান থেকে বাইরে যাই।'

এরপর কয়েকটা গুহায় আমরা ঐরকম একই ছবি দেখলুম। তারপরের একটা গুহায় দেখা গেল হরিণের ছবি।

ধীরেনদা বললেন, 'জানো তো, ঐতিহাসিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, একই দেয়ালে এক যুগের মানুষের আঁকা ছবির ওপর অন্য যুগের মানুষরা ছবি এঁকেছে। খুব বড় ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আনলে বোঝা যায়। চলো, পাশের গুহাটায় চলো, একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি।'

সেই গুহাটা অনেকটা খোলামেলা। খানিকটা উঁচুতেও বটে। মুখটা প্রকাণ্ড, ভেতরটা সরু। একটা ডিমের আধখানা খোলার মতন। পাশের একটা পাথরের ওপর উঠে সেটাতে ঢোকা যায়। সেই গুহার ছাদে আঁকা একসার মানুষের মধ্যে একটা মানুষ একেবারে আলাদা। সেই মানুষটা একটা ঘোড়ায় চড়ে বর্শার মতন একটা জিনিস দিয়ে একটা হরিণকে মারছে।

ধীরেনদা বললেন, 'এটাকে দেখছ? এই ঘোড়ার পিঠে চড়া মানুষ কিন্তু অনেক পরের যুগে আঁকা। মানুষ বেশিদিন ঘোড়ায় চাপতে শেখেনি। এমন কী, রামায়ণ-মহাভারতের সময়েও ছিল না।'

দীপু আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে বললুম, 'রামায়ণ-মহাভারতে ঘোড়া নেই?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, আছে। ঘোড়ায় রথ টেনেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে কেউ চেপেছে কি? রাম-লক্ষ্মণ কিংবা অর্জুনের মতন বীর কখনও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছে? তা কিন্তু করেনি!'

'মহাভারতের যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না?'

'ছিল কি না তা জানি না। কিন্তু সেরকম যুদ্ধের কোনও বর্ণনা নেই। হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধ করার বর্ণনা আছে, শল্য এসেছিলেন হাতিতে চেপে, কিন্তু ঘোড়ায় চেপে কে এসেছিলেন বলো?'

রিনাদি হেসে বললেন, 'তোমাদের ধীরেনদা আগে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, এখন হয়ে উঠছেন ইতিহাসের পণ্ডিত !'

ধীরেনদা রিনাদির ঠাট্টাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'আরও একটা ব্যাপার কী জানো ! এই সব ছবির মধ্যে কিছু-কিছু আছে একদম ভেজাল। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই তো এর কোনও মূল্য বোঝে না। সাহেবদের দেশে এরকম এতকালের পুরনো কোনও ব্যাপার পাওয়া গেলে কত যত্ন করে ঘিরে-টিরে রাখত, পাহারাদার থাকত। কিন্তু এখানে যে-যখন খুশি আসতে পারে, ইচ্ছে মতন এসব ছবি নষ্টও করতে পারে। ভাগ্যিস বেশি লোক এই জায়গাটার খোঁজ রাখে না। তবু কিছু লোক এখানে কোনও কোনও গুহার ছবির পাশে ইয়ার্কি করে নিজেরা ছবি এঁকে গেছে। সেগুলো অবশ্য দেখলেই চেনা যায়।'

রিনাদি বললেন, 'যাই বলো বাপু, জায়গাটা বড্ড নির্জন। আমার তো বেশিক্ষণ থাকলে গা ছম্‌ছম্‌ করে। এখানে যদি কেউ কোনও মানুষকে খুন করে রেখে যায়, অনেক দিনের মধ্যে তা কেউ টেরও পাবে না।'

দীপু বলল, 'মনোমোহন ঝাঁর চাকরকে জিভ-কাটা অবস্থায় এখানেই কোথায় পাওয়া গিয়েছিল না ?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, এই পাহাড়ের নীচে। দু'দিন ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। তারপর এখানকার সাধুজি ওকে দেখতে পেয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা গাড়ি থামিয়ে খবর দেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'সেই লোকটি বেঁচে আছে ?'

'হ্যাঁ, বেঁচে উঠেছে। লোকটি নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। হয়তো মনোমোহন ঝাঁ'র খুনিকেও ও দেখেছে। মুখ দিয়ে শব্দ করে ও কিছু বলতে চায়, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা নেই। ও লেখাপড়াও জানে না ! তা হলে লিখে বোঝাতে পারত।'

আর দু' তিনটে গুহা ঘোরার পর রিনাদি বললেন, 'আমি বাপু আর পারছি না। আমরা ওপরে বসি। এবার দীপু দেখিয়ে আনুক সন্তুকে।'

ধীরেনদা বললেন, 'তাই যাক। অবশ্য একশো তিরিশটা গুহার সব ওরা দেখতে পারবে না একদিনে। যতগুলো ইচ্ছে হয় দেখে আসুক।'

গুহাগুলো ক্রমশই নেমে গেছে পাহাড়ের নীচের দিকে। মাঝে-মাঝে আবার ওপরেও উঠতে হচ্ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম একটার-পর-একটা গুহা।

ছবি অবশ্য বেশির ভাগ গুহাতেই এক রকম। মানুষের ছবিই বেশি। একটাতে দেখতে পেলুম কয়েকটা রথের মতন জিনিসের ছবি।

মিংমা সব সময় আমাদের পেছন-পেছনে ছায়ার মতন আসছে। এখানকার ব্যাপারটা সে বুঝতে পারেনি, আমি যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।

এক-একটা গুহার মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে ছোট-ছোট ছবি খুঁজে বার করার ব্যাপারে ও নিজেই বেশ মজা পেয়েছে। যেগুলো আমরা দেখতে পাই না সেগুলো ও দেখায়।

একটা গুহা বিরাট বড়। এটাকে ঠিক গুহা হয়তো বলা যায় না, নীচে বেশ সিমেণ্টের মেঝের মতন মসৃণ পাথর আর তার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন ঝুলছে। অবশ্য সেই পাথরটা পড়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, হয়তো ঐ অবস্থাতেই রয়েছে কয়েক লক্ষ বছর। মাঝখানের জায়গাটিতে অন্তত পঞ্চাশ বাশ জন লোক শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এত বড় একটা গুহাতে কিন্তু আমরা কোনও ছবি খুঁজে পেলুম না। এক-এক জায়গায় মনে হল যেন ছবি আঁকা ছিল, কেউ ঘষে-ঘষে মুছে দিয়েছে।

আমরা মন দিয়ে সেই গুহার মধ্যে ছবি খুঁজছি, এমন সময় হঠাৎ এমন বিকট একটা আওয়াজ হল যে, দীপু আর আমি দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলুম। আমরা ভয় পাওয়ার চেয়েও চমকে গেছি বেশি। কোনও মানুষ না জন্তু ঐ আওয়াজ করল, তা বুঝতে পারলুম না।

তক্ষুনি আবার সেই আওয়াজটা হল। এবার বুঝলাম, কোনও জন্তু এরকম শব্দ করতে পারে না। মানুষেরই মতন গলা, যেন কেউ কোনও হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে শব্দ করছে হী-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ ! এমনই ভয়ঙ্কর সেই শব্দ যে শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে।

গুহাটার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, আমরা দাঁড়িয়েছিলুম ঘাড় বেঁকিয়ে। সেই অবস্থাতেই মিংমা শাঁ করে ছুটে গেল বাইরে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মিংমার গলার একটা কাতর আওয়াজ পাওয়া গেল, আঃ !

এবার আমি আর দীপুও বাইরে চলে এলুম। এসে যা 'দেখলুম, তা ভাবলে এখনও যেন গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

মিংমা গুহার বাইরে লুটিয়ে পড়ে আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। হ্যাঁ, মানুষই বটে ! সারা মুখ দাঁড়ি-গোঁফে ঢাকা, মাথায় জট-পাকানো চুল, গা-ভর্তি বড় বড় লোম আর দৈত্যের মতন চেহারা। একটা পুরো কলাপাতা তার কোমরে জড়ানো, সেইটাই তার পোশাক, হাতে একটা পাথরের মুগুর। ঠিক ছবিতে দেখা গুহামানব যেন একটি।

লোকটি আগুনের ঢেলার মতন চোখে কটমট করে তাকাল আমাদের দিকে। ঠিক যেন বলতে চায় ; আমার গুহায় তোমরা ঢুকেছ কেন ?

ঐ পাথরের হাতুড়ি দিয়ে মারলে আমার আর দীপুর মাথা তক্ষুনি ছাতু হয়ে যেত। কিন্তু কোনও কারণে আমাদের ওপর দয়া করে মারল না, চট করে সরে গেল পাথরের আড়ালে।

দীপু আর আমি পাথরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলুম। একটুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলুম না। সত্যিই এক লক্ষ বছরের কোনও গুহামানবের বংশধর

এখনও এখানে রয়ে গেছে ?

মিংমা আবার 'আঃ' শব্দ করতেই আমাদের দু'জনের বিস্ময়ের ঘোর ভাঙল। দু'জনে কোনও আলোচনা না-করেই মিংমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে ছুট লাগালুম। বারবার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম, সেই মানুষটা তাড়া করে আসছে কি না !

মিংমার বাঁ কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুগুরের আঘাতটা ওর মাথায় লাগেনি, লেগেছে ঘাড়ে। তাতে ও একটুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই জ্ঞান ফেরায় ও বলল, 'ছোড় দোও, আভি ছোড় দোও !'

বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে আমরা মিংমাকে শুইয়ে দিলুম এক জায়গায়। মিংমা উঠে বসে হাত দিয়ে কানের রক্ত মুছল, মাথাটা ঝাঁকাল। দু' তিনবার। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে এক সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করল। একটা বড় পাথর টপ্ করে তুলে নিয়ে ও তরতর করে ছুটে গেল সেই গুহাটির দিকে। আমাদের বাধা দেবার কোনও সুযোগই দিল না। মিংমা পাহাড়ি জায়গার মানুষ, কেউ আঘাত করলে ওরা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না।

দীপুকে বললুম, 'চলো, আমরাও যাই।'

দীপু আর আমিও তুলে নিলুম দুটো পাথর। তারপর অনুসরণ করলুম মিংমাকে। সেই বড় গুহাটার বাইরে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে দেখা হল ভাল করে। সেখানে ঐ লোকটা ঢোকেনি। মিংমা এদিক-ওদিকেও খানিকটা খুঁজে এসে বলল, 'ভাগ গয়া !'

এখানে কেউ যদি লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে খুঁজে বার করা এক রকম অসম্ভব বললেই হয়। একটা এইরকম ছোট পাহাড়ে এতগুলো গুহা, বোধহয় আর কোথাও নেই।

দীপু বলল, 'চলো, ওপরে গিয়ে বাবাকে বলি !'

ওপরে উঠতে-উঠতে আমি ভাবতে লাগলুম, ব্যাপারটা কী হল ? আজকের দিনে কোনও আদিম গুহামানব কি টিকে থাকতে পারে ? তাও ভূপাল শহরের এত কাছে ? না, অসম্ভব ! এ-কথা শুনলে যে-কেউ হাসবে। তা হলে কেউ আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। কেন ? কেউ কি চায় যে, আমরা আর ঐ গুহাগুলোর মধ্যে না ঢুকি ? একটা পাহাড়ের গুহার মধ্যে আদিম মানুষদের আঁকা ছবি দেখব, এতে কার কী আপত্তি থাকতে পারে ? এই পাহাড়টা নিশ্চয়ই গভর্নমেন্টের সম্পত্তি।

হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ হল, যাকে একটু আগে দেখলুম, মাথায় চুলের জটা, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল---ও-রকম চেহারা তো কোনও সাধুরও হতে পারে। ওপরে একটা গুহায় একজন সাধুবাবা যে মন্দির বানিয়েছেন, তিনিই আমাদের ভয় দেখাতে আসেননি তো ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই ! সাধুবাবা চান যাতে এখানে বাইরের লোকজন না আসে।

যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। দীপু দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে যখন ধীরেনদাকে সব ঘটনাটা বলল, তখন ধীরেনদা হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'দীপু যখন-তখন গল্প বানায়, ভাবে যে আমরা বিশ্বাস করব।'

রিনাদি বললেন, 'তুই মোটেই লেখক হতে পারবি না দীপু, তোর গল্পগুলো বড্ড গাঁজাখুরি হয়। যা, যথেষ্ট হয়েছে, গাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ারগুলো নিয়ে আয়, এবার খেয়ে নেওয়া যাক।'

দীপু বলল, 'তোমরা বিশ্বাস করলে না ? সন্তুকে জিজ্ঞেস করো ! আর ঐ দ্যাখো মিংমার কানের পাশ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে !'

রিনাদি বললেন, 'সন্তু আর কী বলবে, ওকে তো আগে থেকেই শিখিয়ে এনেছিস। মিংমা নিশ্চয়ই আছাড়-টাছাড় খেয়ে পড়েছে কোথাও !'

ধীরেনদা বললেন, 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরিতে গুহামানব, অ্যাঁ ? দু' একটা থাকলে মন্দ হত না ! কেয়া হুয়া মিংমা ? আছাড় খাকে গির্ গিয়া, তাই না ?' মিংমা বলল, 'একঠো আদমি, বহুত তাগড়া জোয়ান পাঠ্যে, হাঁতে পাথরের লাঠি, খুব জোরসে হামায় মারল !'

ধীরেনদার ধারণা হল, মিংমা বোধহয় মিথ্যে কথা বলছে না। তিনি একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'সত্যিই মেরেছে ? তাহলে কোনও পাগল-টাগল হবে বোধহয় !'

রিনাদি বললেন, 'দেখি, কতটা লেগেছে ?'

পরীক্ষা করে দেখা গেল, মিংমার শার্টের নীচে কাঁধেও খানিকটা থেঁতলে গেছে। বেশ জোরেই আঘাত করেছে, মিংমার আরও বেশি ক্ষতি হত, যদি মাথায় লাগত।

ধীরেনদা বললেন, 'চলো তো, সাধুবাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এখানে কোনও পাগল টাগল ঘুরে বেড়ায় কিনা। উনি নিশ্চয়ই জানবেন।'

আমিও তাই চাই। সাধুবাবাকে একবার দেখা দরকার। আমি বললুম, 'চলুন ধীরেনদা, সাধুবাবার কাছে চলুন।'

গুহাগুলোর পাশ দিয়ে যে গলি-গলি মতন রয়েছে, ধীরেনদা সেই পথ খুব ভাল চেনেন। বেশ শর্টকাটে উনি আমাদের চট্ করে নিয়ে এলেন সাধুবাবার আশ্রমের কাছে।

সেখানে জ্বলন্ত ধুনির পাশে একটা খাটিয়ায় একজন মানুষ আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে আশ্রমের দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। দূর থেকে সেই চেহারা দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। পেছন থেকে কাঁধের ভঙ্গিটাই যে খুব চেনা মনে হচ্ছে। আমরা একটু কাছে যেতেই আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সেই মানুষটি মুখ ফেরাল আমাদের দিকে।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম, 'কাকাবাবু !'

॥ পাঁচ ॥

ধীরেনদা, রিনাদিরাও কাকাবাবুকে দেখে যেমন চমকে উঠলেন, তেমনই খুশি হলেন।

মিংমাও 'আংক্‌ল সাব' বলে লম্বা একটা সেলাম দিল।

কাকাবাবু অবশ্য আমাদের দেখে একটুও অবাক হলেন না। বরং তাঁর মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিংমা, তুম্‌হারা কান্‌সে খুন গিরতা। কেয়া হুয়া ?'

এবার দীপুর বদলে আমিই সবিস্তারে ঘটনাটা জানালুম।

কাকাবাবু এতেও বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন, 'হুঁ।' তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মিংমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মুছে ফেলো ! আর ঐ যে গাঁদাফুলের গাছ দেখছ, ওর কয়েকটা পাতা হাত দিয়ে চিপে সেই রসটা কাটা জায়গায় লাগিয়ে দাও !'

ধীরেনদা বললেন, 'কাকাবাবু, আপনি ভূপালে এসেছেন, সেটা আমাদের বিরাট সৌভাগ্য। কিন্তু···আপনি এ জায়গায় কী করে রাস্তা চিনে এলেন ? আপনি ভীমবেঠ্‌কার কথা আগে জানতেন ?'

কাকাবাবু কোনও উত্তর দেবার আগেই আশ্রমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক সাধু। গেরুয়া কাপড় পরা, রোগা লম্বা চেহারা, থুতনিতে একটু-একটু দাড়ি, মাথায় চুলও কম।

কাকাবাবু বললেন, 'নমস্তে, সাধুজি ! আচ্ছা হ্যায় তো ?

সাধুজি চোখ কুঁচকে কাকাবাবুকে ভাল করে দেখে তারপর বললেন, 'কওন ? আরে, ইয়ে তো রায়চৌধুরীবাবু ! রাম, রাম ! ভগবান আপ্‌কা ভালা করে !'

বুঝলুম, কাকাবাবু যে শুধু ভীমবেঠ্‌কার কথা আগে থেকে শুনেছেন তাই নয়। তিনি এখানকার সাধুজিকেও চেনেন !

আরও দু' একটা কথা বলার পর কাকাবাবু সাধুজিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, সাধুজি, আপনার এখানে কোনও পাগল-টাগল ঘুরে বেড়ায় ? এরা একজনকে দেখেছে বলল—'

সাধুজি হিন্দিতে বললেন, 'হাঁ, পাগল তো এক আমিই আছি। আর কোন্ পাগল এখানে থাকবে ?'

একটু থেমে সাধুজি আবার বললেন, 'তবে কী জানেন, রায়চৌধুরীবাবু, রাত্তিরের দিকে কারা যেন এখানে আসে ! আমি শব্দ পাই। আগে, জানেন তো, ভূত-প্রেতের ভয়ে সাঁঝের পর এখানে মানুষজন আসত না। কাছাকাছি গাঁয়ের লোক তো এ-জায়গার নাম শুনলেই ভয় পায়। আমি ভূতপ্রেত মানি না। আমি জানি ওসব কিছু নেই। কিন্তু এখন রাত্তিরে কারা আসে তা আমি জানি না !'

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ, আমিও তাই ভেবেছিলুম।'

উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ্ বগলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'সাধুজি, আমি একটু পরে ঘুরে আসছি। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'চলো!'

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কখন পৌঁছলেন ভূপালে?'

কাকাবাবু হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'এই, এগারোটার সময়। রুমি বলল, যে, সন্তুরা সবাই ভীমবেঠ্‌কায় গেছে। তাই আমিও একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে এলুম।'

রিনাদি বললেন, 'তা হলে তো আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়নি। আমাদের সঙ্গে খাবার আছে, আসুন আমরা খেয়ে নিই।'

কাকাবাবু বললেন, 'বেশ তো!'

গাড়ি থেকে আমরা টিফিন কেরিয়ারগুলো আর জলের বোতল নামিয়ে নিলুম। তারপর গিয়ে বসলুম একটা বিরাট পাথরের ছায়ায়।

রিনাদি যে কতরকম খাবার এনেছেন তার ঠিক নেই। হ্যাম স্যাণ্ডুইচ, সসেজ, স্যালামি, চিকেন রোস্ট, রাশিয়ান স্যালাড, আরও কত কী!

খাওয়া শুরু করার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু আপনি হঠাৎ ভূপালে এলেন কেন? তখন না বলেছিলেন…'

কাকাবাবু বললেন, 'আসতে হল বাধ্য হয়ে। ঐ যে নিপু, ও একটা গাধা! কলকাতায় গিয়ে বারবার বলছিল, ভূপালে তিনটে খুন হয়েছে! খুনি ধরা কি আমার কাজ? কিন্তু নিপু একবারও বলেনি, যে তিনজন খুন হয়েছেন, তাঁরা তিনজনই পরস্পরকে চিনতেন, তিনজনেই গবেষণা করতেন ইতিহাস নিয়ে।'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, অর্জুন শ্রীবাস্তবকে সব সময় ইতিহাসের বই-ই পড়তে দেখেছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'অর্জুন শ্রীবাস্তব, সুন্দরলাল বাজপেয়ী, মনোমোহন ঝা—এঁরা তিনজনেই ইতিহাসের নাম-করা পণ্ডিত। সুন্দরলাল বাজপেয়ীর সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল, একবার ভূপালে এসে আমি সুন্দরলালের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম।'

রিনাদি বললেন, 'তা হলে তো ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনাও…'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঐতিহাসিক হিসেবে ওঁর ভারতজোড়া নাম। চিরঞ্জীব আমার বিশেষ বন্ধু। একবার আফগানিস্তানে আমরা দু'জনে একসঙ্গে এক্সকাভেশানে গিয়েছিলাম। সেবারেই একটা দুর্ঘটনায় আমার একটা পা নষ্ট হয়ে যায়।'

ধীরেনদা বললেন, 'ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন শুনেই আপনি ভূপালে এসেছেন তা হলে?'

কাকাবাবু বললেন, 'অর্জুন শ্রীবাস্তব, সুন্দরলাল বাজপেয়ী আর মনোমোহন

ঝা-র মৃত্যুর খবর কলকাতার কাগজে বেরোয়নি। নিপু যদি এঁদের নাম বলত, তা হলে আমি তখুনি বুঝতে পারতুম। যাই হোক, চিরঞ্জীব শাকসেনার উধাও হয়ে যাবার খবর সব কাগজেই বেরিয়েছে। সেইসঙ্গে আগের তিনটে খুনের খবর। তখনই আমি বুঝতে পারলুম, এগুলো সাধারণ খুন নয়। কেউ একজন বেছে-বেছে ঐতিহাসিকদের মারছে কেন ? এর মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে। এদের সরিয়ে দেওয়ায় কার কী স্বার্থ থাকতে পারে, সেটাই আগে দেখা দরকার। সেইজন্যই আমি এসেছি।'

ধীরেনদা বললেন, 'আশ্চর্য ! বেছে-বেছে শুধু ইতিহাসের পণ্ডিতদের মেরে কার কী লাভ ? কেউ কি কোনও ইতিহাস মুছে দিতে চায় ?'

কাকাবাবু বললেন, 'সেই জন্যই রুমির কাছে শোনামাত্র চলে এলুম এখানে। মনে হল, তোমাদের এখানে কোনও বিপদ হতে পারে।'

আমি আর ধীরেনদা দু' জনেই একসঙ্গে বলে উঠলুম, 'এখানে, কেন !'

কাকাবাবু বললেন, 'ছোটখাটো একটা বিপদ যে ঘটেই গেছে, তা তো দেখাই যাচ্ছে !'

তারপর মিংমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'মিংমা, তুমি চিন্তা কোরো না। তোমায় যে আঘাত করেছে, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। আমার হাত থেকে সে কিছুতেই ছাড়া পাবে না।'

মিংমা বলল, 'ও আদমি আভিতক ইধার উধার হ্যায় !'

কাকাবাবু বললেন, 'রয়নে দেও। ধরা সে পড়বেই !'

রিনাদি বললেন, 'তোমরা কাকাবাবুকে পাঁচমারির ঘটনাটা বলো !'

ধীরেনদা তখন ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনার ভাই বিজয় শাকসেনার সঙ্গে পাঁচমারিতে দেখা হয়ে যাওয়া এবং তার পরের ঘটনা জানালেন কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর অনেকটা আপন মনেই বললেন, 'তিনজন খুন হয়েছে, আর একজন নিরুদ্দেশ, প্রত্যেকেই ইতিহাসের পণ্ডিত। এমনও হতে পারে, ইতিহাসের কোনও একটা বিষয় নিয়েই এঁরা চারজন গবেষণা করছিলেন। চিরঞ্জীব শাকসেনা এই ভীমবেঠকা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন গত মাসে। সেইজন্য আমার সন্দেহ হচ্ছে, সমস্ত রহস্য আছে এই ভীমবেঠকা পাহাড়ের গুহাগুলোর মধ্যেই। খাওয়া শেষ তো, এবার ওঠা যাক, অনেক কাজ বাকি আছে। ধীরেনবাবু, আপনার ওপর দু'একটা দায়িত্ব দেব।'

ধীরেনদা বললেন, 'আমাকে 'বাবু' আর 'আপনি' বলবেন না। শুধু ধীরেন বলুন।'

কাকাবাবু বললেন, 'বেশ তো ধীরেন, তুমি এখন মিংমাকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও, ওর চোটের জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে দেবে। তারপর ফোলডিং খাট কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়, সেরকম দুটো খাটও জোগাড় করা দরকার।

আজ সন্ধের পর থেকে মিংমা আর আমি এখানে থাকব।'

ধীরেনদা অবাক হয়ে বললেন, 'এখানে থাকবেন ? রাত্তিরবেলা ?'

'হ্যাঁ। আমি আগেও তো এখানে থেকেছি। ১৯৫৮ সালে এই গুহাগুলো আবিষ্কার হবার ঠিক পরের বছরই চিরঞ্জীব আর আমি এখানে এসে দু'রাত্তির ছিলাম। তখন গুহাগুলোর মার্কিং হচ্ছিল।'

আমি বললুম, 'তাহলে তিনটে খাট লাগবে। আমিও থাকব।'

ধীরেনদা রিনাদির দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি যদি বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি সামলাতে পারো, তা হলে আমিও কাকাবাবুর সঙ্গে এখানে থেকে যাই। যদি কাকাবাবুর সঙ্গে নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হতে পারি—'

রিনাদি বললেন, 'সে তোমার ইচ্ছে হলে থাকো না ! আমি বাড়িতে ঠিক ম্যানেজ করতে পারব।'

কাকাবাবু বললেন, 'অত লোক থাকলে কোনও লাভ হবে না। ধীরেন তোমাকে শহরে থেকেই কিছু কাজ করতে হবে। সন্তুরও থাকবার দরকার নেই। মিংমা তো থাকছেই আমার সঙ্গে।'

মিংমা বলল, 'নেহি, সন্তু সাব্‌ভি রহেগা। আচ্ছা হোগা !'

কাকাবাবু বললেন, 'তবে তাই হোক। চলো, এখন আমাকেও একবার শহরে যেতে হবে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, কিছু কেনাকাটিও আছে।'

কাকাবাবু যে গাড়িটা এনেছিলেন, সেটা এখনও রয়েছে। মিংমা ধীরেনদাদের গাড়িতে উঠল, আমি রইলুম কাকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক হল যে, বিকেল পাঁচটার সময় আমরা ধীরেনদার বাড়িতে আবার মীট করব।

গাড়িতে ওঠার সময় কাকাবাবু বললেন, 'ধীরেন, তোমরা একটু সাবধানে থেকো। হঠাৎ কোনও বিপদ হতে পারে। রাত্তিরবেলা বাড়ির দরজা-জানলা সব ভালভাবে বন্ধ করে রাখবে।'

ধীরেনদা হেসে বললেন, 'বারে ! আমরা থাকব নিজেদের বাড়িতে, আর আপনারা থাকবেন পাহাড়ের ওপর খোলা জায়গায়। আপনি আমাদের বলছেন সাবধানে থাকতে ?'

'আমাদের তো অভ্যেস আছে। আমরা আগে থেকে বিপদের গন্ধ পাই। কিন্তু তোমরা যে আজ ভীমবেঠকায় এসেছ, আমার সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, এতে তোমাদের ওপর শত্রুপক্ষের নজর পড়তে পারে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, কোনও সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর দল এর পেছনে আছে। যারা এইরকম বীভৎসভাবে খুন করতে পারে—'

'আপনারা এখানে ক'দিন থাকবেন ?'

'তার কোনও ঠিক নেই। এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।'

'তা হলে আমি কিন্তু একটা রাত অন্তত আপনাদের সঙ্গে এখানে কাটাব।'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে। তা হলে বিকেল পাঁচটায় ?'

দুটো গাড়িই ছাড়ল একসঙ্গে। কাকাবাবু কয়েকটা জায়গায় থামলেন। আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে উনি যেন কার কার সঙ্গে দেখা করে এলেন। দেখা যাচ্ছে কাকাবাবু ভূপালের অনেককেই চেনেন।

তারপর আর-একটা বাড়ির সামনে এসে বললেন, 'সন্তু এবার তুই চল আমার সঙ্গে।'

সেই বাড়ির গেটের পাশে নেম প্লেটে লেখা ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনার নাম।

বেশ বড় তিনতলা বাড়ি, সামনে-পেছনে অনেকখানি বাগান। বড়-বড় ইউক্যালিপটাস গাছ রয়েছে সেই বাগানে। কয়েকটা পাথরের মূর্তিও দেখতে পেলাম। এক জায়গায় একটা বেঞ্চে বসে আছে দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ।

এত বড় বাড়িটা কিন্তু একদম চুপচাপ। কোনও লোকজনের শব্দ নেই। আমরা গেট ঠেলে ঢুকতেই একজন পুলিশ এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

কাকাবাবু জানালেন, যে তিনি ডক্টর শাকসেনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান।

পুলিশটি বলল যে, তিনি কারুর সঙ্গেই দেখা করছেন না। খবরের কাগজ থেকে অনেক লোক এসেছিল, সবাই ফিরে গেছে। ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা নিরুদ্দেশ হয়েছেন প্রায় আটদিন আগে, এই ক'দিনে তাঁর স্ত্রী একবারও তিনতলা থেকে নীচে নামেননি।

কাকাবাবু নিজের একটা কার্ড দিয়ে বললেন, 'এটা ভেতরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। উনি আমার সঙ্গে ঠিকই দেখা করবেন।

একটু বাদেই বাড়ির ভেতর থেকে বুড়োমতন একজন লোক বেরিয়ে এসে আমাদের ডেকে বলল, 'আপলোগ আইয়ে।'

চিরঞ্জীব শাকসেনার স্ত্রীর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রং একদম মেমসাহেবের মতন। একটা চওড়া হলুদপাড় সাদা শাড়ি পরে আছেন। এঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। পরে জানলুম, ইনি গুজরাটের মেয়ে হলেও একটানা আট বছর ছিলেন শান্তিনিকেতনে।

বসবার ঘরে ঢুকেই উনি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী, আপনি কবে এসেছেন?'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বসুন, ভাবিজি, বসুন। আজই এসেছি, দাদার খবরটা শুনেই চলে এলুম। ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো!'

ভদ্রমহিলা বেশ শক্ত আছেন, শোকে-দুঃখে ভেঙে পড়েননি। এই আট দিনের মধ্যেও যে চিরঞ্জীব শাকসেনার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি, এক হিসেবে সেটাই ভাল খবর। তার মানে ওঁকে এখনও মেরে ফেলা হয়নি। কোনও এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই।

উনি বললেন, 'আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না তো আপনাকে কী বলব। উনি আগের দিন বিদেশ থেকে ফিরলেন, খুব ক্লান্ত ছিলেন, ভাল করে

কথাই বলতে পারিনি…পরদিন থেকেই নিখোঁজ। কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, কার সঙ্গে গেলেন, কিছুই জানি না।'

'এর মধ্যে অন্য কেউ কোনও চিঠি বা খবর পাঠায়নি ?'

'না। এই ছেলেটি কে ?'

'ও আমার ভাইপো, ওর নাম সন্তু। আচ্ছা ভাবিজি, একটা কথা মনে করে বলুন তো, অর্জুন শ্রীবাস্তব, মনোমোহন ঝাঁ আর সুন্দরলাল বাজপেয়ী—এঁরা শেষ কবে আপনার বাড়িতে এসেছিলেন ? এঁদের আপনি চেনেন নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ চিনি। এঁরা তো প্রায়ই আসতেন।'

'শেষ কবে এসেছিলেন ?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, ভেবে দেখি, হ্যাঁ, উনি বিদেশ যাবার ঠিক আগের সন্ধেবেলাতেই তো এসেছিলেন সবাই। আরও অনেকে এসেছিলেন, কিন্তু ওঁরা ছিলেন অনেক রাত পর্যন্ত।'

'কী কথা হয়েছিল বলতে পারেন ?'

'তা তো জানি না। ওঁরা তো প্রায়ই দরজা বন্ধ করে কী সব আলোচনা করতেন। সেদিন ওঁরা চার-পাঁচজন মিলে খুব চিল্লাচিল্লি করেছিলেন বটে।'

'চার-পাঁচজন ? ঠিক ক'জন ছিলেন ?'

'তা তো জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে ওরা সবাই তো খুব চায়ের ভক্ত, কয়েকবার করে চা পাঠাতে হয়েছে। প্রত্যেকবার পাঁচ কাপ করে।'

'তার মানে অন্তত পাঁচজন। আমরা চারজনের হিসেব পাচ্ছি, আর একজন কে ?'

'তা জানি না। ওরা চারজনই বেশি আলোচনা করতেন, হয়তো সেদিন আরও কেউ একজন ছিলেন। অনেকেই তো আসতেন নানা কাজে।'

'চিরঞ্জীবদাদা বিদেশে থাকার সময় ওঁর যে তিনজন বন্ধু এখানে খুন হয়েছেন, সে-কথা উনি জেনেছিলেন ?'

'যেদিন ফিরলেন, সেদিনই আমি বলিনি। ভেবেছিলাম কী, পরে এক সময় বলব। আসার সঙ্গে-সঙ্গেই এমন একটা আঘাত…'

'অন্য কেউ বলে দিতে পারে ?'

'আমি বিজয়কেও নিষেধ করে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, ভাল কথা। ভাবিজি, বিজয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে ?'

'সে তো হোসাঙ্গাবাদ হাসপাতালে আছে। পাঁচমারিতে ডাকাতরা তাকে গুলি করেছিল। তবে জখম বেশি হয়নি, দু' চারদিনের মধ্যে ফিরে আসবে।'

'চিরঞ্জীবদাদার যে একজন খুব বিশ্বাসী লোক ছিল, সব সময় সঙ্গে থাকত, কী নাম যেন…ও হ্যাঁ, ভিখু সিং, সে কোথায় ?'

'উনি বিদেশে যাবার সময় যে ছুটি নিয়ে নিজের বাড়ি গিয়েছিল। ওর বাড়ি বিলাসপুর। এতদিনে তার ফিরে আসার কথা। কিন্তু সে আসেনি।'

'হুঁ! ঠিক আছে, ভাবিজি, আমরা এবার যাব। বেশি চিন্তা করবেন না। আজ বা কাল যদি দৈবাৎ চিরঞ্জীবদাদা ফিরে আসেন, তবে বলবেন যে, আমি ভীমবেঠ্‌কায় আছি।'

এতক্ষণ বাদে চমকে উঠলেন চিরঞ্জীব শাকসেনার স্ত্রী বীণা দেবী। তিনি বললেন, 'ভীমবেঠ্‌কায়? কেন? আপনি ওখানে থাকবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? ভীমবেঠ্‌কায় তো থাকার জায়গা নেই, রাত্তিরবেলা কোনও বিপদ হতে পারে···মানে, আপনার দু' পা ঠিক নেই···না, না, ও-কাজ করবেন না!'

'ভাবিজি, কিছুদিন ধরে চিরঞ্জীবদাদা ঐ ভীমবেঠ্‌কা নিয়ে খুব চিন্তা করছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওখানে যে ব্রাহ্মী লিপি আছে, তার নাকি পাঠোদ্ধার অনেকখানি করেছেন, এরকম তো শুনছিলাম।'

'অনেকখানি করেছেন? পুরোটা পারেননি?'

'সেই রকমই তো জানি।'

'বুঝলাম। এবার তা হলে আমরা উঠি।'

বীণাদেবী ব্যাকুলভাবে বললেন, 'আপনি রাতে ঐ নিরালা জায়গায় থাকবেন এটা আমার মনে ভাল লাগছে না। দিনকাল ভাল না, কখন কী হয়···।'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার সঙ্গে অন্য আরও লোক থাকবে। তা ছাড়া আমি তো চিরঞ্জীবদাদার মতন ভালমানুষ নই, আমার সঙ্গে রিভলভার থাকে।'

বীণাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলুম ধীরেনদার বাড়িতে।

মীংমাকে ডাক্তার ইঞ্জেকশান আর ওষুধ দিয়েছেন। একটা ব্যাণ্ডেজও বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা খুলে ফেলেছে মিংমা। ও বলেছে, ব্যাণ্ডেজের কোনও দরকার নেই।

সে-কথা শুনে কাকাবাবু বললেন, 'ও ঠিক আছে।'

তিনখানা ফোলডিং-খাট, কম্বল, নানারকম খাবার্-দাবার গুছিয়ে রাখা হয়েছে এর মধ্যেই। ছোড়দিরাও এখানে এসে জড়ো হয়েছে। আমরা তিনজন ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ে থাকব শুনে ধীরেনদার মতন নিপুদা আর রত্নেশদা যেতে চাইল সঙ্গে। কিন্তু কাকাবাবু আর কারুকে নেবেন না।

ছোড়দি আমায় কিছুতেই যেতে দিতে চায় না। কাকাবাবুকে তো আর কেউ ফেরাতে পারবে না। কিন্তু ভূপালে এসে আমার যদি কোনও বিপদ হয়, তবে সেটা যেন ছোড়দিরই দায়িত্ব।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, 'বাবা আমায় কী বলে দিয়েছেন জানিস না? কাকাবাবু যখন যেখানে থাকবেন, সব সময় আমাকে ওঁর সঙ্গে থাকতে হবে।'

আর দেরি করলে পাহাড়ে উঠতে বেশি রাত হয়ে যাবে। সেইজন্য কাকাবাবু

বললেন, 'চলো, এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

ধীরেনদা বললেন, 'কিন্তু আপনাদের খবর পাব কী করে? কাল সকালে কি আমরা কেউ যাব?'

কাকাবাবু বললেন, 'না, তোমাদের যাবার দরকার নেই। আমরা দু'দিনের মতন খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে যদি না ফিরি, তা হলে একজন কেউ কিছু খাবার পৌঁছে দিয়ে এসো।'

'কিন্তু আপনার ভাড়া-করা গাড়িটা তো ওখানে দু'দিন থাকবে না, পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। হঠাৎ যদি আপনাদের ভূপালে আসার দরকার হয়, তা হলে আসবেন কী করে?'

'সে-ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিকই, তোমাদের যাতে বেশি চিন্তা না হয়, সেই জন্য এটা তোমাদের দেখিয়ে রাখছি।'

কাকাবাবু তাঁর কিট ব্যাগ খুলে রেডিওর মতন যন্ত্র দেখালেন। ওটা একটা শক্তিশালী ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশান সেট। বহু দূরে খবর পাঠানো যায়।

আমি জানি, কাকাবাবু কলকাতার বাইরে কোথাও গেলেই ঐ যন্ত্রটা সব সময় সঙ্গে রাখেন।

মিংমা আর আমি ড্রাইভারের পাশে বসলুম। কাকাবাবু পেছনের সীটে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'পৌঁছতে অন্তত দেড়-দু' ঘণ্টা লাগবে, ততক্ষণ আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।'

॥ ছয় ॥

সন্ধে হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি আলো মিলিয়ে যায়নি। দূর থেকে ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়টা দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। মনে হয় যেন একটা সাধারণ উঁচু টিলা। এর ভেতরে যে অতগুলো গুহা আছে, তা কল্পনা করাই শক্ত। আসলে পাহাড়টা একটা মৌচাকের মতন, রক শেলটার বা গুহাতেই ভর্তি।

কাকাবাবু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন। ওপরে পৌঁছবার পর আমরা ওঁকে জাগিয়ে দিলুম। মালপত্রগুলো সব বয়ে নিয়ে যাওয়া হল সাধুবাবার আশ্রমের কাছে। তারপর গাড়িটা ফিরে গেল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝুপ করে নামল অন্ধকার। সেই অন্ধকার এমন কুচকুচে কালো যে পাশের লোককেও দেখা যায় না। শুধু দূরে দেখা যায় ধুনির আগুন।

সাধুবাবা সত্যিকারের সাহসী লোক। রাত্তিরে এখানে উনি একা থাকেন। যে দু তিনজন লোককে দিনের বেলা ওঁর আশ্রমে দেখছিলুম, তারা পাহাড়ের নীচের গ্রামের লোক। সন্ধেবেলা ফিরে যায়।

ধুনির আগুনের কাছাকাছি আমাদের খাটগুলো পেতে ফেলা হল। রাত্তিরে

মিংমা আমাদের জন্য রান্না করবে। মিংমা দারুণ খিচুড়ি রাঁধে।

সাধুবাবা ধ্যানে বসেছেন, ওঁর সঙ্গে কোনও কথা বলা গেল না। কাকাবাবু ঘড়ির ওপর টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'সাড়ে সাতটা বাজে, রাত দশটা আন্দাজ চাঁদ উঠবে, তখন আমরা একটু বেড়াতে বেরুব।'

জায়গাটা যে কী অসম্ভব নিস্তব্ধ, তা বলা যায় না। এখানে ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত নেই। সেরকম একটা জঙ্গলও দেখিনি এই পাহাড়ে। মাঝে-মাঝে একটা দুটো বড় গাছ, তবে ছোট গাছই বেশি। অবশ্য দুপুরবেলা গুহাগুলো দেখতে যখন পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে নীচে নামছিলাম, তখন আরও নীচের দিকে জঙ্গলের মতন দেখেছি। আমরা ঘুরেছিলাম মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা গুহায়, এ ছাড়াও কত গুহা না-দেখা রয়ে গেছে।

দিনের বেলায় ধীরেনদার সেই কথাটা মনে পড়ল। তাই আমি কাকাবাবুকে বললুম, 'আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা এই ক'দিন একটা বেশ ভালমতন গুহার মধ্যে থাকলে পারতুম না?'

কাকাবাবু বললেন, 'হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেকালের মানুষের পক্ষে গুহায় থাকাই সবচেয়ে সুবিধের ছিল। কিন্তু একালে মানুষই সবচেয়ে হিংস্র। আমাদের যদি কেউ মারতে চায়, তাহলে গুহার বাইরে থেকে গুলি চালিয়ে খুব সহজেই মেরে ফেলতে পারে। তা ছাড়া, আমরা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে বসে রইলে চারিদিকে নজর রাখতে পারব না।'

তারপর সাধুবাবার আশ্রমের দিকে হাত তুলে বললেন, 'দেখেছিস, সাধুজি কী চমৎকার জায়গা বেছেছেন। সামনে এতখানি পরিষ্কার জায়গা, তিন দিকে যেন ঠিক পাথরের উঁচু দেয়াল। সবাইকে এখানে সামনে দিয়েই আসতে হবে। এখানে বসে থাকলে গাড়ির রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়।'

সাধুবাবা একটা হরিণের ছালের ওপর জোড়াসনে শিরদাঁড়া একদম সোজা করে বসে আছেন। চোখ দুটো বোজা। আমরা যে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, তাতেও উনি একবারও চোখ খোলেননি।

মিংমা মুগ্ধ হয়ে সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই হিমালয় পাহাড়ে এরকম আরও সাধু দেখেছে, তাই ওর চেনা লাগছে। আমি গল্পের বইয়ের ছবিতে ছাড়া এরকম কোনও ধ্যানমগ্ন সাধুকে দেখিনি। উনি কি সারারাতই এইভাবে থাকবেন নাকি?

কাকাবাবু আমায় বললেন, 'খাওয়া হয়ে গেলে তুই আর মিংমা যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তে পারিস। আমি রাত আড়াইটে পর্যন্ত জাগব। তারপর মিংমাকে তুলে দেব।'

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। পৌনে আটটা মোটে। সময় যেন কাটতেই চায় না।

একটু বাদে মিংমা স্টোভ জ্বেলে রান্না চাপিয়ে দিল। আমি ওর পাশে বসে

ব্যগ্রভাবে চেয়ে রইলুম। রান্না দেখা ছাড়া আর তো কোনও কাজ নেই।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে আমি চমকে ভয় পেয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ছিলুম আর একটু হলে। মিংমা হিহি করে হেসে উঠল। আসলে আওয়াজটা মোটেই বিকট কিংবা অদ্ভুত নয়। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই প্রথমে মনে হয়েছিল, দুপুরবেলা শোনা গুহার বাইরে সেই শব্দের কথা।

আগে লক্ষ্য করিনি, আশ্রমের সামনের চাতালের এক কোণে একটি গোরু শুয়ে আছে। দুপুরে বরং এখানে একটি কুকুর দেখেছিলুম, সেটা এখন নেই। বোধহয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে নীচে নেমে গেছে।

কিন্তু গোরুটা হঠাৎ ডেকে উঠল কেন ? আমি টর্চ নিয়ে গেলুম গোরুটার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে গোরুর চোখে টর্চের আলো পড়লে ঠিক আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলজ্বল করে। মনে হয় কোনও হিংস্র প্রাণী।

গোরুটা আর একবার ডাকল, হা-ম-বা।

আর অমনি সাধুবাবা চেঁচিয়ে বললেন, 'বোম্ ভোলা-মহাদেও-শঙ্করজি !'

এবার সাধুবাবার ধ্যানভঙ্গ হল। মনে হল, গোরুটাই যেন সাধুবাবার ঘড়ির কাজ করে। সাধুবাবা যাতে ধ্যান করতে করতে সারা রাত কাটিয়ে না দেন কিংবা ঘুমিয়ে না পড়েন, সেই জন্য গোরুটা রোজ এই সময় ওঁর ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে বললেন, 'সাধুজি, আমরা আপনার অতিথি হয়ে এসেছি। এখানে থাকব।

সাধুবাবা বললেন, 'হাঁ, হাঁ, থাকুন। আরামসে থাকুন। কোই বাত নেই। এ-পাহাড় তো আমার নয়। পাহাড়, সমুন্দর, জঙ্গল— এ সবই ভগবানকা, যে-কোনও মানুষ থাকতে পারে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি ঠিক বললেন না, সাধুবাবা। দিন কাল বদলে গেছে। ভগবানের আর অত বেশি সম্পত্তি এখন নেই। পৃথিবীর সব পাহাড় আর জঙ্গলই এখন কোনও না কোনও গভর্নমেন্টের। আমি যদি এই পাহাড়ে বাড়ি বানিয়ে থাকতে যাই, অমনি সরকারের লোক এসে আমাদের ধরবে। সমুদ্রের কিছুটা জায়গা এখনও খালি আছে বটে।'

সাধুবাবা বললেন, 'আমি তো এখানে আছি বহোত দিন।'

'আপনাদের কথা আলাদা। আপনি সাধুবাবা, আমাদের সরকার এখনও সাধু-সন্ন্যাসীদের কিছু বলে না। আচ্ছা সাধুজি, আপনি যে বলছিলেন, রাত্রে এখানে শব্দ শুনতে পান, তা কিসের শব্দ ? মানুষের চলাফেরার ?'

'হাঁ, হাঁ।'

'একজন মানুষ, না অনেক ?'

'দো-তিন আদমি আসে মনে হয়।'

'আপনি কোনও গাড়ির শব্দ পান ? তারা গাড়িতে আসে ?'

মিংমা আমাদের জন্য রান্না করবে। মিংমা দারুণ খিঁচুড়ি রাঁধে।

সাধুবাবা ধ্যানে বসেছেন, ওঁর সঙ্গে কোনও কথা বলা গেল না। কাকাবাবু ঘড়ির ওপর টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'সাড়ে সাতটা বাজে, রাত দশটা আন্দাজ চাঁদ উঠবে, তখন আমরা একটু বেড়াতে বেরুব।'

জায়গাটা যে কী অসম্ভব নিস্তব্ধ, তা বলা যায় না। এখানে ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত নেই। সেরকম একটা জঙ্গলও দেখিনি এই পাহাড়ে। মাঝে-মাঝে একটা দুটো বড় গাছ, তবে ছোট গাছই বেশি। অবশ্য দুপুরবেলা গুহাগুলো দেখতে যখন পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে নীচে নামছিলাম, তখন আরও নীচের দিকে জঙ্গলের মতন দেখেছি। আমরা ঘুরেছিলাম মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা গুহায়, এ ছাড়াও কত গুহা না-দেখা রয়ে গেছে।

দিনের বেলায় ধীরেনদার সেই কথাটা মনে পড়ল। তাই আমি কাকাবাবুকে বললুম, 'আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা এই ক'দিন একটা বেশ ভালমতন গুহার মধ্যে থাকলে পারতুম না?'

কাকাবাবু বললেন, 'হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেকালের মানুষের পক্ষে গুহায় থাকাই সবচেয়ে সুবিধের ছিল। কিন্তু একালে মানুষই সবচেয়ে হিংস্র। আমাদের যদি কেউ মারতে চায়, তাহলে গুহার বাইরে থেকে গুলি চালিয়ে খুব সহজেই মেরে ফেলতে পারে। তা ছাড়া, আমরা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে বসে রইলে চারদিকে নজর রাখতে পারব না।'

তারপর সাধুবাবার আশ্রমের দিকে হাত তুলে বললেন, 'দেখেছিস, সাধুজি কী চমৎকার জায়গা বেছেছেন। সামনে এতখানি পরিষ্কার জায়গা, তিন দিকে যেন ঠিক পাথরের উঁচু দেয়াল। সবাইকে এখানে সামনে দিয়েই আসতে হবে। এখানে বসে থাকলে গাড়ির রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়।'

সাধুবাবা একটা হরিণের ছালের ওপর জোড়াসনে শিরদাঁড়া একদম সোজা করে বসে আছেন। চোখ দুটো বোজা। আমরা যে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, তাতেও উনি একবারও চোখ খোলেননি।

মিংমা মুগ্ধ হয়ে সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই হিমালয় পাহাড়ে এরকম আরও সাধু দেখেছে, তাই ওর চেনা লাগছে। আমি গল্পের বইয়ের ছবিতে ছাড়া এরকম কোনও ধ্যানমগ্ন সাধুকে দেখিনি। উনি কি সারারাতই এইভাবে থাকবেন নাকি?

কাকাবাবু আমায় বললেন, 'খাওয়া হয়ে গেলে তুই আর মিংমা যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তে পারিস। আমি রাত আড়াইটে পর্যন্ত জাগব। তারপর মিংমাকে তুলে দেব।'

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। পৌনে আটটা মোটে। সময় যেন কাটতেই চায় না।

একটু বাদে মিংমা স্টোভ জ্বেলে রান্না চাপিয়ে দিল। আমি ওর পাশে বসে

ব্যগ্রভাবে চেয়ে রইলুম। রান্না দেখা ছাড়া আর তো কোনও কাজ নেই।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে আমি চমকে ভয় পেয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ছিলুম আর একটু হলে। মিংমা হিহি করে হেসে উঠল। আসলে আওয়াজটা মোটেই বিকট কিংবা অদ্ভুত নয়। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই প্রথমে মনে হয়েছিল, দুপুরবেলা শোনা গুহার বাইরে সেই শব্দের কথা।

আগে লক্ষ্য করিনি, আশ্রমের সামনের চাতালের এক কোণে একটি গোরু শুয়ে আছে। দুপুরে বরং এখানে একটি কুকুর দেখেছিলুম, সেটা এখন নেই। বোধহয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে নীচে নেমে গেছে।

কিন্তু গোরুটা হঠাৎ ডেকে উঠল কেন ? আমি টর্চ নিয়ে গেলুম গোরুটার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে গোরুর চোখে টর্চের আলো পড়লে ঠিক আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলজ্বল করে। মনে হয় কোনও হিংস্র প্রাণী।

গোরুটা আর একবার ডাকল, হা-ম-বা।

আর অমনি সাধুবাবা চেঁচিয়ে বললেন, 'বোম্ ভোলা-মহাদেও-শঙ্করজি !'

এবার সাধুবাবার ধ্যানভঙ্গ হল। মনে হল, গোরুটাই যেন সাধুবাবার ঘড়ির কাজ করে। সাধুবাবা যাতে ধ্যান করতে করতে সারা রাত কাটিয়ে না দেন কিংবা ঘুমিয়ে না পড়েন, সেই জন্য গোরুটা রোজ এই সময় ওঁর ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে বললেন, 'সাধুজি, আমরা আপনার অতিথি হয়ে এসেছি। এখানে থাকব।

সাধুবাবা বললেন, 'হাঁ, হাঁ, থাকুন। আরামসে থাকুন। কোই বাত নেই। এ-পাহাড় তো আমার নয়। পাহাড়, সমুন্দর, জঙ্গল— এ সবই ভগবানকা, যে-কোনও মানুষ থাকতে পারে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি ঠিক বললেন না, সাধুবাবা। দিন কাল বদলে গেছে। ভগবানের আর অত বেশি সম্পত্তি এখন নেই। পৃথিবীর সব পাহাড় আর জঙ্গলই এখন কোনও না কোনও গভর্নমেণ্টের। আমি যদি এই পাহাড়ে বাড়ি বানিয়ে থাকতে যাই, অমনি সরকারের লোক এসে আমাদের ধরবে। সমুদ্রের কিছুটা জায়গা এখনও খালি আছে বটে।'

সাধুবাবা বললেন, 'আমি তো এখানে আছি বহোত দিন।'

'আপনাদের কথা আলাদা। আপনি সাধুবাবা, আমাদের সরকার এখনও সাধু-সন্ন্যাসীদের কিছু বলে না। আচ্ছা সাধুজি, আপনি যে বলছিলেন, রাত্রে এখানে শব্দ শুনতে পান, তা কিসের শব্দ ? মানুষের চলাফেরার ?'

'হাঁ, হাঁ।'

'একজন মানুষ, না অনেক ?'

'দো-তিন আদমি আসে মনে হয়।'

'আপনি কোনও গাড়ির শব্দ পান ? তারা গাড়িতে আসে ?'

'না, গাড়ির আওয়াজ পেয়েছি না।'

'হুঁ। আচ্ছা, আপনি রাত্রে কী খাবেন ? আমাদের হাতের রান্না আপনি খাবেন কি ?'

সাধুজি জানালেন, না, উনি রাত্রে শুধু এক বাটি দুধ ছাড়া আর কিছু খান না। উনি ঘুমোনও খুব তাড়াতাড়ি। ধুনির আগুনে মাঝে-মাঝে কাঠ ফেলার জন্য অনুরোধ জানিয়ে উনি একটু বাদেই চলে গেলেন আশ্রম-গুহার মধ্যে।

মিংমা রান্না সেরে ফেলার পর আমরাও খেয়ে নিলুম।

কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। সাড়ে নটা বাজবার পর পাশের পাহাড়ের আড়াল থেকে একটু-একটু করে উঠতে দেখা গেল চাঁদের মুখ। আস্তে আস্তে গাঢ় অন্ধকারটা পাতলা হয়ে একটু আলো ফুটে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, 'চলো, সবাই মিলে একটু ঘুরে আসা যাক। খাওয়ার পর একটু হাঁটাও হবে।'

খানিকক্ষণ হেঁটে আমরা প্রথম সারির গুহাগুলোর কাছে দাঁড়ালুম। টর্চ নিভিয়ে দিতেই গা'টা কেমন ছমছম করে উঠল। এ রকম অদ্ভুত অনুভূতি আমার আর কোনও জায়গায় গিয়ে হয়নি। মনে হল, আমরা যেন পঞ্চাশ হাজার কিংবা এক লক্ষ বছর আগেকার সময়ে ফিরে গেছি। আদিম গুহাবাসী মানুষরা এখানে থাকে। এক্ষুনি তাদের কারুকে দেখতে পাব। আবছা আলোয় একটু দূরের পাথরের চাঁইগুলোকে মনে হচ্ছে কালো কালো হাতির পাল।

আর থাকতে না পেরে আমি টর্চ জ্বেলে ফেললুম।

তারপরই দারুণ ভয় পেয়ে বলে উঠলুম, 'ও কী !'

টর্চের আলোটা সোজা যেখানে গিয়ে পড়েছে, সেখানে একটা পাথরের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে একজন মানুষ।

কাকাবাবুও দেখতে পেয়েই সঙ্গে-সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে বললেন, 'হু ইজ দেয়ার ? উধার কৌন হ্যায় ?'

লোকটি তাতেও নড়ল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, 'দো হাত উপর উঠাকে সামনে চলা আও। নেহি তো গোলি চালায় গা !'

লোকটি এবার আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ধুতি আর শার্ট পরা, গ্রাম্য লোকের মতন চেহারা। কিন্তু মুখে একটা হিংস্র ভাব। আমাদের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল, তারপর সামনে এগিয়ে আসার বদলে চট্ করে লুকিয়ে পড়ল একটা পাথরের আড়ালে।

সেইটুকু সময়ের মধ্যেই কাকাবাবু ওকে গুলি করতে পারতেন বটে, কিন্তু মারলেন না।

চাপা গলায় আমায় বললেন, 'সন্তু, টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে চট্ করে শুয়ে পড় মাটিতে।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা বড় পাথরের টুকরো গিয়ে পড়ল আমাদের পেছনে। ঐ পাথরটা মাথায় লাগলে আর দেখতে হত না।

তারপরই মিংমার গলার আওয়াজ পেলুম, 'আংকেল সাব, পাকাড় গ্যায়া।'

মিংমা বুদ্ধি করে এরই মধ্যে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পেছন দিক দিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলেছে। আমি টর্চ জ্বেলে ছুটে গেলুম সেই পাথরটার কাছে।

মিংমা সেই লোকটার দুটো হাত পেছন দিকে মুচড়ে ধরে আছে। ছোটখাটো চেহারা হলেও মিংমার শরীরে দারুণ শক্তি। এ লোকটা ওর সঙ্গে জোরে পারবে কেন!

ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবুর এসে পৌঁছতে একটু দেরি হল। তিনি বললেন, 'সন্তু, এর মুখে ভাল করে আলো ফেলে দ্যাখ তো, এই লোকটাই দুপুরে তোদের ভয় দেখিয়েছিল কিনা!'

আমি সঙ্গে-সঙ্গেই বললুম 'না।'

মিংমাও মাথা ঝাঁকাল। কারণ, এই লোকটা বেশ রোগা আর মুখখানা লম্বাটে। বয়েসও যথেষ্ট, প্রায় ষাটের কাছাকাছি। পরচুলা আর নকল দাড়ি লাগিয়েও ওর পক্ষে আদিম গুহাবাসীর ছদ্মবেশ ধরা সম্ভব নয়।

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে এ-লোকটা এখানে একা বসে আছে কেন? সন্তু, দ্যাখ তো ওর জামার পকেটে কী আছে? মিংমা, ভাল করে ধরে থাকো ওকে।'

জামার পকেটে একটা বিড়ির কৌটো, দেশলাই আর কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। কাগজপত্র কিছু নেই। কিন্তু লোকটির কোমরের কাছে কী যেন একটা শক্ত, উঁচু জিনিস হাতে লাগল। জামাটা তুলে দেখলুম, একটা বেশ বড় ভোজালি ওর কোমরে গোঁজা।

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ! সঙ্গে এত বড় ছুরি, আবার পাথর ছুঁড়ে আমাদের মারতে চেয়েছিল, তা হলে তো উনি সাধারণ কোনও লোক নন। এই, তুম্ কৌন্ হ্যায়?'

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

'তুম কাঁহে পাথ্থর ফেকা? হামলোগ তুম্‌হারা দুশ্‌মন হ্যায়?'

লোকটা তবুও চুপ।

'ইত্‌না রাতমে কাঁহে ইধার বৈঠা থা? তুম্‌হারা মতলোব কেয়া হ্যায় ঠিক বাত্ বাতাও!'

লোকটা তবু কোনও সাড়া-শব্দ করে না।

কাকাবাবু এবার মিংমাকে বললেন, 'আর একটু জোরে চাপ দাও তো! দেখি ও কথা বলে কি না!'

মিংমা লোকটার হাত দুটো বেশি করে মুচড়ে দিতে লাগল। একটু একটু

করে লোকটার মুখে ফুটে উঠল ব্যথার চিহ্ন। তারপর এক সময় সে চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাঁ, অ্যাঁ—'।

ঠিক বোবা মানুষদের মতন আওয়াজ!

টর্চের আলোয় দেখা গেল, লোকটার মুখের মধ্যে জিভ নেই। জিভ ছাড়া কোনও মানুষের মুখ তো আমি আগে দেখিনি! মুখের ভেতরটা অদ্ভুত গোল, দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে।

আমি উত্তেজিতভাবে বললুম, 'কাকাবাবু!'

কাকাবাবু বললেন, 'তুই বুঝতে পেরেছিস, সন্তু? এ লোকটা নিশ্চয়ই মনোমোহন ঝাঁর সেই চাকর, যার জিভ কেটে দেওয়া হয়েছে।'

আমি বললুম, 'ওকে জিভ-কাটা অবস্থায় এই পাহাড়ের কাছেই পাওয়া গিয়েছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখানকার পুলিশের কাছে সেই খবর শুনে আমার আরও সন্দেহ হয়েছিল, এই পাহাড়টা ঘিরেই সব রহস্য আছে।'

'এই লোকটা কথা বলতে পারবে না। আর লিখতে-পড়তেও জানে না...।'

'কিন্তু জায়গা চেনার ক্ষমতা ওর আছে। খুঁজে-খুঁজে এখানে আবার এসেছে নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবার জন্য।'

কাকাবাবু মিংমাকে বললেন, লোকটিকে ছেড়ে দিতে। তারপর ওকে বললেন, 'শুনো, হামলোগ তুমহারা মনির মনোমোহন ঝাঁ-জিকা দুশমন নেহি। হামলোগ তুম্‌হারা ভি দোস্ত্ হ্যায়। খুনিকো হামলোগ পাকাড়নে চাতা হ্যায়।'

লোকটি কাকাবাবুর কথা কতটা বুঝতে পারল কে জানে। তবে মনোমোহন ঝাঁ'র নামটা শুনে একটু বোধহয় ভাবান্তর দেখা গেল।

কাকাবাবু আবার হিন্দিতে বললেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। আমরা এখানে থাকছি, তুমিও সঙ্গে থাকবে।'

লোকটিকে আমাদের সঙ্গে আসবার ইঙ্গিত করে কাকাবাবু চলতে শুরু করলেন। লোকটা কয়েক পা এল পেছন-পেছন। তারপরই হঠাৎ দৌড় লাগাল।

মিংমা আর আমি দু'জনেই দৌড়লাম ওকে ধরবার জন্য। কিন্তু লোকটা যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে আমরা ফিরে এলুম কাকাবাবুর কাছে। দিনের বেলায়ই কেউ এখানে লুকোতে চাইলে তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল, আর রাত্তিরবেলা তো অসম্ভব।

কাকাবাবু আফসোস করে বললেন, 'রাগে-দুঃখে লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে আমাদের কথা শুনল না কেন? ও একা একা কী করে প্রতিশোধ নেবে? শত্রুপক্ষ যে অতি ভয়ংকর, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। চল্, আমরা এবার শুয়ে পড়ি।'

আমরা আবার ফিরে এলুম আশ্রমের কাছে। শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলুম ঐ জিভ-কাটা মানুষটির কথা! ইশ্, মানুষ এত নিষ্ঠুরও হয় যে, অন্য একজন মানুষের জিভ কেটে দিতে পারে! ওরা তো আরও তিনজন নিরীহ ঐতিহাসিককে খুন করেছে। মনোমোহন ঝা'র এই সঙ্গীটিকে তো ওরা খুন করতে পারত, তার বদলে শুধু জিভ কেটে দিল কেন? আরও বেশি অত্যাচার করবার জন্য?

সহজে ঘুম আসতে চায় না। চিৎ হয়ে শুলেই ওপরে দেখা যায় আকাশ। এখন কয়েকটা তারাও ফুটেছে। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। দু' একটা শুকনো পাতা উড়ে যাবার খরখর শব্দ শুনতে পাচ্ছি এক-একবার। তারপর দূরে এক জায়গায় যেন একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ পেলাম। কাকাবাবু বললেন, 'ও কিছু না।'

তারপর কখন যেন চোখ বুজে এসেছিল। আর-একবার একটা শব্দ পেয়ে আবার জেগে উঠলুম।

কাকাবাবু ধুনির আগুনে কাঠ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কাকাবাবুর হাতে একটা কাপ। এর মধ্যে কখন যেন নিজের জন্য কফি বানিয়ে নিয়েছেন। রাত এখন ক'টা বাজে কে জানে। পাশের খাটে মিংমা ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

এক সময়ে চোখে আলো পড়তে ঘুম ভেঙে গেল। ওমা, সকাল হয়ে গেছে দেখছি! তাহলে সারা রাত কিছুই ঘটেনি?

কাকাবাবু আর মিংমা সাধুবাবার সঙ্গে চা-খেতে-খেতে গল্প করছেন। তা হলে আমাদের তৈরি চা খেতে আপত্তি নেই সাধুবাবার।

তড়াক করে নেমে পড়লুম খাট থেকে।

কাকাবাবু বললেন, 'বিছানা তুলে খাটটা ফোল্ড করে ফ্যাল, সন্তু! খাটগুলো সব আশ্রমের পিছন দিকে লুকিয়ে রাখতে হবে। দিনের বেলা এখানে কিছু-কিছু লোক আসতে পারে। আমরা যে এখানে থাকি, তা তাদের জানানোর দরকার নেই।'

এখানে জলের বেশ সমস্যা আছে। আমরা দুটো বড় ফ্ল্যাস্ক ভর্তি জল এনেছিলাম, সে তো মুখ হাত ধুতেই ফুরিয়ে যাবে। সারাদিন আমাদের অনেক জলের দরকার হবে।

সাধুবাবা জানালেন যে, পাহাড়ের নীচে নেমে খানিকটা দক্ষিণে গেলে যে গ্রামটা আছে, সেখানকার কুয়ো থেকে জল আনা যায়। অথবা, পাকা রাস্তা ধরে নেমে গেলে মাইল দু'এক দূরে যে লেভেল ক্রসিং আছে একটা, সেখানকার গুমটি-ঘরের পাশে টিউবওয়েল আছে।

আমরা জলের ব্যবস্থার কথা আগে চিন্তা করিনি। ঠিক হল যে, আমি আর মিংমা নীচে যাব জলের সন্ধানে। সাধুবাবার শিষ্যরা তাঁর জন্য দু'তিন দিন চলার মতন জল একেবারে এনে দেয়।

আমরা পাঁউরুটি আর জেলি খেয়ে নিলুম। তারপর কাকাবাবুকে রেখে মিংমা আর আমি বেরিয়ে পড়লুম জলের জন্য।

কাল রাত্তিরবেলা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় পাহাড়টাকে কী রকম ভয়ের জায়গা বলে মনে হচ্ছিল। এখন দিনের আলোয় সব কিছুই সুন্দর। সেই জিভকাটা লোকটা কি এখনও লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ের মধ্যে ? তাহলে সে খাবে কী ? আর সেই লোকটা, যে গুহা-মানব সেজে আমাদের ভয় দেখিয়েছিল ?

দিনের আলোয় ভয় থাকে না, তবু আমরা এগোতে লাগলুম সাবধানে। গুহাগুলো সবই পাহাড়ের এক দিকে, অন্য দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের উপত্যকায়। আমরা হাঁটতে লাগলুম সেই ফাঁকা দিকটা ঘেঁষে।

কিছুক্ষণ নামবার পর একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। মিংমাকে নিয়ে আমি লুকোলুম একটা গাছের আড়ালে। গাড়িটা এই পাহাড়ের ওপরেই আসছে।

গাড়িটা হুশ করে আমাদের পেরিয়ে যাবার পর আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'আরেঃ ! এই, থামো, থামো !'

চ্যাঁচামেচি শুনে গাড়িটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আবার ব্যাক করে এল। গাড়িতে ধীরেনদা আর রত্নেশদা। ওঁরা বোধহয় আর থাকতে পারেননি, ভোর রাতেই বেরিয়ে পড়েছেন আমাদের খোঁজ নিতে।

ধীরেনদা বললেন, 'কী, তোমরা সব ঠিকঠাক আছ তো ?'

আমরা গাড়িতে উঠে পড়ে বললুম, 'গাড়ি ঘোরান, আমাদের জল আনতে যেতে হবে। আপনারা এসে পড়েছেন, বেশ ভালই হল, হাঁটতে হবে না।'

ধীরেনদা বললেন, 'তাই তো, এখানে যে জল নেই, সেটা আমারও খেয়াল হয়নি।'

'যখন এক সময় মানুষ থাকত, তখন তারা জল পেত কোথায় ?'

ধীরেনদা বললেন, 'তখনকার লোকেদের তো কোনও কাজ ছিল না, তারা পাহাড়ের তলা থেকে রোজ জল নিয়ে আসত। কিংবা তখন হয়তো, কোনও ঝরনা ছিল এই পাহাড়ে। এখন শুকিয়ে গেছে। এক লক্ষ বছর আগে কী ছিল, তা তো বলা যায় না !

আমরা ফ্ল্যাস্ক দুটো এনেছিলাম, কিন্তু ঐটুকু জলে তো চলবে না। তাই ধীরেনদা আমাদের নিয়ে গেলেন কাছাকাছি একটা ছোট শহরে। জায়গাটার নাম ওবায়দুল্লাগঞ্জ। সেখান থেকে কেনা হল বড়-বড় তিনটে কলসি। এক দোকান থেকে বেশ গরম-গরম জিলিপি আর কচুরি খেয়ে নিলাম পেট ভরে। কাকাবাবুর জন্যও নিয়ে যাওয়া হল কিছু।

ফেরার পথে কলসির জল ছলাত ছলাত করে পড়তে লাগল গাড়িতে। আমি আর মিংমা ধরে বসে আছি।

রত্নেশদা বলল, 'কাল সকালেও তো আবার জল আনতে যেতে হবে। আবার আসতে হবে আমাদের।'

ধীরেনদা বললেন, 'ভাবছি, একজন ড্রাইভারসুদ্ধু একটা গাড়ি জোগাড় করে আজ বিকেলে এখানে পাঠিয়ে দেব। যে-কদিন দরকার, সে এখানে থাকবে।'

আমি বললুম, 'না, না, গাড়ির দরকার নেই। যেমনভাবে আগেকার গুহাবাসীরা নীচে থেকে জল আনত, সেইরকমভাবে কাল থেকে আমি আর মিংমা জল বয়ে আনব।'

পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে আশ্রমের সামনে কাকাবাবুকে দেখতে পেলুম না। সাধুবাবাও নেই।

গুহাগুলোর দিকে গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই অবশ্য কাকাবাবুকে পাওয়া গেল। যে বড় গুহাটার নাম অডিটোরিয়াম অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহ, সেটার সামনে একটা বড় পাথরের ওপর বসে কাকাবাবু একটা কাগজে সেটার ছবি আঁকছেন।

ধীরেনদাদের দেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে, তোমরা কেমন আছ? রাত্তিরে কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি তো?'

ধীরেনদা হেসে ফেলে বললেন, 'না, কিছু হয়নি। আপনারাও তো ভালই আছেন দেখছি!'

কিছুক্ষণ গল্প করার পর ধীরেনদারা চলে গেলেন। তার একটু পরেই আবার শুনতে পেলুম একটা গাড়ির আওয়াজ।

॥ সাত ॥

দ্বিতীয়বার গাড়ির আওয়াজ শুনে কাকাবাবু বললেন, 'হয়তো কোনও ভিজিটর আসছে। আমি এখানে বসে ছবি আঁকব, তোরা দু'জনে দু'দিকে চলে যা। বাইরের লোকেদের সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।'

মিংমা চলে গেল আশ্রমের দিকে। আমি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে চলে এলুম রাস্তার ধারে একটা গুহার কাছে। এ দিকের কয়েকটা গুহা আমাদের দেখা হয়নি।

এখানে রয়েছে একটা দোতলা গুহা। একটা ছোট গুহার অনেক ওপরে আর একটা। প্রকৃতিই নিজের খেয়ালে এরকম বানিয়েছে। ওপরের গুহাটায় ওঠা খুব সহজ নয়, পাশের একটা বড় পাথর বেয়ে-বেয়ে উঠতে হয়। খানিকটা ওপরে ওঠার পর পরিষ্কার দেখতে পেলুম রাস্তাটা।

একটা কালো রঙের গাড়ি এসে বড় নিমগাছটার তলায় থামল। তারপর গাড়ি থেকে যিনি নামলেন, তাঁকে প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল, বুঝি কোনও ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা সাহেব। বেশ লম্বা, ধপধপে ফর্সা রং, মাথার চুল একদম সাদা। বেশ রাশভারী চেহারা।

লোকটি গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাল।

এরপর নামল আরও দু'জন গাঁট্টাগোঁট্টা গুণ্ডার মতন চেহারার লোক।

একজনের হাতে লম্বা একটা বাক্স। বেশ সন্দেহজনক চরিত্র। এদের ইতিহাসে কোনও আগ্রহ আছে কিংবা গুহার মধ্যে আঁকা ছবি দেখবার জন্য এতদূর আসবে, তা ঠিক মনে হয় না। তাছাড়া এরা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এই জায়গাটা ওদের বেশ চেনা।

গাড়ি থেকে নেমেই ওরা কাকে যেন খুঁজছে মনে হল। চারিদিকটা দেখবার পর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কিছু বলে ওরা এগোল আশ্রমের দিকে।

আমার মনে হল, কাকাবাবুকে বোধহয় সাবধান করে দেওয়া উচিত। নামবার জন্য পা বাড়াতেই আর একটু হলে আমি খতম হয়ে যেতাম। একটা আলগা পাথরে পা দিতেই সেটা গড়াতে-গড়াতে দারুণ শব্দ করে পড়ল নীচে। আমি কোনও রকমে ঝুঁকে একটা পাথরের দেয়াল ধরে সামলে নিলুম।

পাথরের আওয়াজ শুনতে পেয়ে লোক তিনটি থেমে গেল, দু'জন ছুটে এল এদিকে। আমার তখন তাড়াতাড়ি নামবার উপায় নেই, এক যদি ওপরের গুহাটার মধ্যে লুকনো যায়। কিন্তু একটা পাথর সরে যাওয়ায় অনেকখানি উঁচুতে পা দিতে হবে। আমি ওপরে ওঠবার আগেই ওরা এসে পৌঁছে গেল। আমি আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। ফর্সা-লম্বা লোকটি এসে পড়ে আমাকে ভাল করে দেখল। তারপর আমাকে দারুণ অবাক করে দিয়ে ভাঙা-বাংলায় বলল, 'এ খোঁকা, তোমার চাচাজি কোথায় আছে ?'

এই লোকটা আমায় চেনে ? কাকাবাবুর কথা জানে ? কিংবা শত্রুপক্ষের লোক, খবর পেয়ে আমাদের ধরতে এসেছে।

আমি কোনও উত্তর দিলুম না বলে লোকটি এবার হুকুমের সুরে বলল, 'নীচে উতারকে এসো।'

পালাবার উপায় নেই, নামতেই হবে। আমি বসে পড়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নীচে নামতে লাগলুম। ওদের একজন লোক একটু উঠে এসে আমার কোমর ধরে মাটিতে নামাল !

ফর্সা-লম্বা লোকটির চোখের মণি নীল রঙের। যথেষ্ট বয়েস হলেও বোঝা যায় গায়ে বেশ শক্তি আছে। আবার গম্ভীর গলায় বলল, 'কোথায় তোমার চাচাজি ? চলো।'

আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে বললুম, 'কা-কা-বা-বু! আপনাকে খুঁজতে এ-সে-ছে !'

ফর্সা লম্বা লোকটি এবার হেসে বলল, 'হুঁ ! ছোকরা বিলকুল তৈয়ার ! তার মানে তোমার কাকাবাবু কাছাকাছিই আছে। চলো, চলো।'

ওর গুণ্ডামতন একজন সঙ্গী আমার হাত ধরল। আমি হাঁটতে লাগলুম অডিটোরিয়াম গুহার দিকে। কাকাবাবুকে সাবধান করে দিয়েছি, এবার যা ব্যবস্থা করার উনিই করবেন।

যা ভেবেছি ঠিক তাই। একটু আগে তিনি যেখানে বসে ছবি আঁকছিলেন,

এখন সেখানে নেই। নিশ্চয়ই আমার চিৎকার শুনতে পেয়ে লুকিয়েছেন।

ফর্সা-লম্বা লোকটি গুহার মধ্যে একবার উঁকি মেরে দেখে বলল, 'এখানে ছিল ? নেই তো, কাঁহা গেল ?'

তারপর আমাকে আরও সাঙ্ঘাতিক অবাক করে দিয়ে সেই লোকটি চেঁচিয়ে ডাকল, 'রাজা ! রাজা ! এদিকে এসো !'

কাকাবাবুর ডাকনাম রাজা। একমাত্র আমার বাবা ছাড়া আর কারুকে ঐ নাম ধরে ডাকতে শুনিনি। এই লোকটি সেই নাম জানল কী করে ?

এবার একটা গুহার আড়াল থেকে রিভল্‌ভার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। রিভলভারটা পকেটে ভরতে-ভরতে হেসে বললেন, চিরঞ্জীবদাদা !'

বুঝতে বাকি রইল না যে, ইনিই ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা।

ডক্টর শাকসেনা এগিয়ে গিয়ে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর খানিকটা স্নেহের সুরে বকুনি দিয়ে বললেন, 'রাজা, তুমি কি পাগল বনে গেছ ? এই খোঁকাকে সাথ্ নিয়ে তুমি এখানে রাত কাটাচ্ছ ? কত্ত রকম বিপদ হতে পারে।'

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, আপনি ভাবিকে দিয়ে অতগুলো মিথ্যে কথা বলালেন, ভাবির খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওঁর তো মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই।'

'তুমি বুঝতে পারলে ? তাজ্জব কথা !'

'হ্যাঁ, ভাবির সঙ্গে একটুক্ষণ কথা বলেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে, উনি জানেন, আপনি কোথায় আছেন। তার মানে, আপনি নিরুদ্দেশ হননি, ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছেন।'

'তোমাকে ফাঁকি দেবার উপায় কী আছে। বীণার বোঝা উচিত ছিল, তোমাকে সত্যি কথা বলতেই পারত।'

'আপনি বলে গিয়েছিলেন, যেন কেউ জানতে না পারে।'

'কী করি বলো। বিদেশ থেকে ফিরতে না-ফিরতেই যদি শুনলাম কী যে অর্জুন, সুন্দরলাল আর মনোমোহন মার্ডার হয়ে গিয়েছে, অমনি সামঝে নিলাম কী মাই লাইফ আল্‌সো ইজ ইন ডেইনজার।'

'তখন আপনি আপনার ভাইপো বিজয়কে নিয়ে পাঁচমারি গিয়ে লুকোলেন।'

'পাঁচমারি খুব লোন্‌লি জায়গা। ভাবলাম কী, ওখানে কেউ খোঁজ পাবে না, আমারও বিশ্রাম হবে। কিন্তু ওরা ঠিক হাজির হল।'

'চিরঞ্জীবদাদা, ওরা মানে কারা ? সেটা বুঝেছেন ?'

'না। এখনও জানি না। বাট দে আর আ ডেঞ্জারাস লট্। পাঁচমারিতেও হঠাৎ আমার সামনে একটা লোক এসে গোলি চালিয়ে দিল। খত্‌মই হয়ে যেতাম, বুঝলে, রাজা, ঝটাক্‌সে বিজয় এসে পড়ল মাঝখানে। আমার বদলে সে-ই জীবন দিতে যাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, শুনেছি, সে আপনাকে খুব ভক্তি করে। যাক, সে বেঁচে গেছে শুনেছি।'

'আমিই তাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে জিম্মা করে দিয়েছি।'

পাশের লোক দুটিকে দেখিয়ে ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'এঁরা দু'জন পুলিশ অফিসার। তারপর থেকে এঁদের প্রটেকশান নিতে বাধ্য হয়েছি। ঠিক আছে, আপলোগ গাড়িমে যাকে আরাম করিয়ে।'

পুলিশ দু'জন চলে যাবার পর ডক্টর শাকসেনা আর কাকাবাবু পাশাপাশি বসলেন একটা পাথরে। মিংমাও আমাদের কথাবার্তা শুনে এসে হাজির হয়েছে এর মধ্যে। কাকাবাবু মিংমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ডক্টর শাকসেনার। আমরাও দু'জনে বসলুম সামনের একটা গুহার মুখে বেদীর মতন জায়গায়।

চিরঞ্জীব শাকসেনা পকেট থেকে লম্বা একটা চুরুট বার করে ধরালেন। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এবার বলো তো, রাজা, এই ভীমবেঠকায় রাত-পাহারা দেবার মতন বে-পট্ ভাবনা তোমার মাথায় এল কী করে?'

কাকাবাবু বললেন, 'তাতে আমি ভুল করিনি নিশ্চয়ই। ভীমবেঠকা সম্পর্কে আপনারা নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি?'

'নতুন আর কী হবে?'

'নির্ঘাত নতুন কিছু পেয়েছেন?'

'শোনো, আইডিয়াটা প্রথমে আসে মনোমোহনের মাথায়। সে একদিন বলল কী, এখানে যে এত গুহার মধ্যে ছবি আছে, তার সব ছবি সির্ফ ছবি নয়। সেগুলো ভাষা। তার মানে চিত্রভাষা। মিশরে পিরামিডের মধ্যে যেমন হিয়েরোগ্লিফিক্স, অর্থাৎ ছবির মধ্যে ভাষা আছে, সেই রকম!'

'আমিও সেই রকমই আন্দাজ করেছিলুম দাদা।'

'তুমি তো জানো রাজা, ঐ মনোমোহন ছিল, অ্যামেচার হিস্টোরিয়ান। তার কথা প্রথমে আমরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। আহা বেচারা বড় ভাল-মানুষ ছিল। হার্ট অফ গোল্ড যাকে বলে। কে ওকে মারল?'

'সেইটাই তো কথা, ওঁকে মারল কে?'

'এ জরুর কোনও ম্যানিয়াকের কাজ। নইলে কী এমন বীভৎস ভাবে গলা কাটে?'

'কোনও ম্যানিয়াক বেছে-বেছে শুধু ইতিহাসের পণ্ডিতদের খুন করবে কেন? যাই হোক, সে-কথা পরে ভাবা যাবে। আপনি বলুন, মনোমোহন এই গুহার চিত্রলিপি সম্পর্কে কী জেনেছিলেন?'

'শুনলে ওয়াইল্ড আইডিয়া বলে মনে হবে। সে বলল, কিছু-কিছু ছবির মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে। সেই ছবি দিয়ে যেন কিছু বলা হচ্ছে। মনোমোহন সেই ভাষা পড়বার জন্য খুব মেতে উঠল আর আমরা হাসলুম।'

'মনোমোহনজি কিছু প্রমাণ করতে পেরেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। বড় তাজ্জবের কথা। এক গুহার ছবি দেখে মনোমোহন বলল, এতে লেখা আছে, 'মহান বীর ভোমা তাঁর নিজের বাসগুহাতেই শুয়ে রইলেন।'

'এর তো একটাই মানে হয়।'

'ঠিক বলেছ। আমরা আধা বিশ্বাস আর অবিশ্বাস নিয়ে দেখলাম কী, যে-গুহাতে এই ছবি আছে, সেই গুহার জমিন খুব প্লেন, আর সেখানে পাথরের সঙ্গে মিশে আছে মাটি। জায়গাটা খোঁড়া হল। সেখানে পাওয়া গেল এক কঙ্কাল। বহুত পুরনো—'

'কোন্ পীরিয়ড ?'

'চালকোলিথিক হবে মনে হয়। আমরা তো অ্যাসটাউণ্ডেড। সেই কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া গেল কয়েকটা দামি জহরত। টারকোয়াজ ! তার দাম তুমি জানো। এখন মনোমোহন তো আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য ঐ গুহার মধ্যে একটা কঙ্কাল আর দামি জহরত পুঁতে রাখেনি।'

'এটা কতদিন আগের কথা ?'

'পাঁচ মাস।'

'এ আবিষ্কারের কথা তো কোনও কাগজে বেরোয়নি দাদা ?'

'ইচ্ছে করেই গোপন রেখেছি। ঠিক প্রমাণ দাখিল না করলে সবার কাছে লাফিং স্টক হয়ে যাব না ? চিত্রভাষার অ্যালফাবেট তো বুঝাতে হবে ? সেই কঙ্কাল আর জহরত জমা রেখেছিলাম এখানকার মিউজিয়ামে।'

'অর্থাৎ সুন্দরলাল বাজপেয়ীর কাছে। সে-ও জেনেছিল।'

'সুন্দরলালেরই তো বেশি উৎসাহ হল। মনোমোহনকে নিয়ে সেও এখানে আসতে লাগল ঘন ঘন। কিন্তু মুশকিল বাধল, ঐ যে ছবির প্যাটার্ন, তা কিন্তু সব গুহাতে নেই। অধিক সংখ্যার গুহাতেই সাধারণ ছবি, বিচ্ছিরি ছবি। আদিম মানুষদের মধ্যে দু'একজন থাকত শিল্পী স্বভাবের, তারা ইচ্ছামতন এঁকেছে। সেখানে চিত্রভাষা নেই। এর মধ্যে অর্জুন শ্রীবাস্তব আবার প্রমাণ করে দিলে যে, এত্তগুলো রক শেল্টারের মধ্যে পাঁচ জায়গার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা। ভিন্ন জাতের। সেই ছবি খুব পুরনো দেখতে লাগলেও আসলে নতুন, করিব এক দেড় হাজার বছরের বেশি বয়েস না !'

'তার থেকে আবার নতুন কিছু পাওয়া গেল ?'

'মনোমোহন বলল, এই যে পাঁচটা রক শেলটারের ছবি, এর মধ্যেও চিত্রভাষা আছে। তখন তো পুরোদমে লিপি চলছে, তবু কেউ ইচ্ছা করে ছবির মধ্যে সাঙ্কেতিক কিছু লিখে রেখে গেছে।'

'এখানে তো ব্রাহ্মী লিপিও আছে, আপনি তা পড়ে ফেলেছেন ?'

তার মধ্যে এমন কিছু নেই। শুধু কয়েকটা নাম। কিন্তু আমাদের মনোমোহন আবার একটা চিত্রভাষা পাঠ করে ফেলল। আমার বিদেশ যাবার

ঠিক চার-পাঁচ দিন আগে।'

'কী সেটা ?'

'বুঝলে রাজা, আমার তো ধারণা সেটা গল্প। কেউ চিত্রভাষায় একটা গল্প লিখে গেছে। যদি অবশ্য ঐ ভাষা সত্যি হয়।'

'তবু বলুন, দাদা, কী লেখা আছে সেই গুহায় ?'

'সেটা পড়ে মনে হয়, মধ্যযুগে কোনও এক রাজা তার রাজ্য হারিয়ে শত্রুর তাড়া খেয়ে এখানে কোনও গুহায় লুকিয়ে ছিল। তারপর এখানেই তার মৃত্যু হয়। গুহার দেয়ালে ছবিতে লেখা আছে যে, অক্ষম, বৃদ্ধ, পরাজিত এক রাজা বড় অতৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে। তবু এখানেই রইল তার সব কিছু। চল্লিশ মানুষ দূরে রইল চল্লিশ। কোনও বংশধর একদিন পেলে নতুন রাজ্য পত্তন করবে।'

'চিরঞ্জীবদাদা, এ তো শুনে মনে হচ্ছে কোনও গুপ্তধনের সঙ্কেত।'

'আবার গাঁজাখুরি গল্পও হতে পারে। লোভী লোকদের জন্য কেউ ভাঁওতা দিয়েছে। এর মধ্যে সঙ্কেত কোথায় ? চল্লিশ মানুষ দূরে চল্লিশ, তার মানে কে বুঝবে বলো ?'

'একমাত্র আপনিই বুঝতে পারবেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্কেত ও হেঁয়ালি, এই বিষয়ে আপনার থিসিস আছে, আমি জানি।'

'কিন্তু আমি মাথা ঘামাবার সময় পেলাম কোথায় ! চলে তো গেলাম দেশের বাইরে।'

'দাদা এমনও তো হতে পারে যে, আপনি যখন বিদেশে ছিলেন, তখন মনোমোহন বা সুন্দরলাল বা অর্জুন শ্রীবাস্তব এরা কেউ এই সঙ্কেতের অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছে। অর্থাৎ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে।'

'তা অসম্ভব কিছু নয়।'

'আপনার বাড়িতে যখন এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, তখন আর কে উপস্থিত ছিল ?'

'আর কে ছিল, কেউ না !'

'আপনারা পাঁচজন ছিলেন। বীণা ভাবিজি পাঁচ কাপ করে চা পাঠিয়েছেন।'

'পাঁচজন ? অর্জুন, সুন্দরলাল, মনোমোহন, আমি আর হাঁ হাঁ, তুমি ঠিক বলেছ তো, প্রেমকিশোর ছিল এক দু'দিন।'

'এই প্রেমকিশোর গুপ্তধনের কথা শুনেছে।'

'তা শুনেছে।'

'তা হলে তো ঐ প্রেমকিশোরের ওপরেই সন্দেহ পড়ে। সে কোথায় ? তিনজন খুন হয়েছে ? আপনাকেও মারার চেষ্টা হয়েছিল। অর্থাৎ আপনারা চারজন এই পৃথিবী থেকে সরে গেলে শুধু প্রেমকিশোরই ঐ গুপ্তধনের কথা জানবে। এই সব ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই সে আছে।'

চিরঞ্জীব শাকসেনা হেসে বললেন, 'প্রেমকিশোর কে তা তুমি জানো না ? সে তো সুন্দরলালের ছেলে। সতেরো-আঠারো বছর মাত্র বয়েস, দিল্লিতে কলেজে পড়ে। কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে এসেছিল।'

কাকাবাবু একটুখানি চুপ করে গেলেন। আমি ওঁদের কথাবার্তা গোগ্রাসে গিলছিলুম এতক্ষণ। আমারও মনে হয়েছিল পঞ্চম ব্যক্তিই এ-সব কিছুর জন্য দায়ী। কিন্তু প্রেমকিশোরের এত কম বয়েস ? তা ছাড়া, সে তো আর তার বাবাকেও খুন করবে না।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রেমকিশোর এখন কোথায় তা জানেন ?'

ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'দিল্লিতেই আছে নিশ্চয়ই। আমি তো ফিরে এসে আর কোনও খবর পাইনি !'

'এক্ষুনি তার খোঁজ নেওয়া দরকার। তারও তো কোনও বিপদ হতে পারে। এখন আমারও মনে পড়ছে বটে, সুন্দরলালের বাড়িতে তার ছেলেকে দেখেছিলুম, তখন সে খুবই ছোট। সুন্দরলাল খুবই ভালবাসত তার ছেলেকে।'

'তা ঠিক।'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন, দাদা !'

'তাই চলো, ফিরে যাওয়া যাক !'

'না, আমি ফিরে যাবার কথা বলিনি। যে গুহাটায় আপনারা ঐ গুপ্তধনের

সঙ্কেতলিপি পেয়েছেন, আমি সেই গুহাটা দেখতে চাই।

'সেটা অনেক নীচে। খুবই দুর্গম জায়গায়, তুমি সেখানে যেতে পারবে না।'

'ঠিক পারব।'

'তুমি ক্রাচ্ বগলে নিয়ে অতখানি নামবে ? তোমার খুবই কষ্ট হবে। তা ছাড়া, রাজা, তুমি এই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছ কেন ? আমি পুলিশকে সব জানিয়েছি...'

'চিরঞ্জীবদাদা, কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। আর বিপদের মধ্যে না জড়ালে বিপদকে জয় করা যাবে কীভাবে ?'

'রাজা, তুমি এখনও এই কথা বলতে পারো ! কিন্তু আমি বুড়ো হয়ে গেছি, থকে গেছি, আমি এখন ক্লান্ত। আমি এখন বিশ্রাম নিতে চাই...তবু চলো, তুমি যখন বলছ...'

॥ আট ॥

সরু রাস্তা দিয়ে পাথরের ওপর পা দিয়ে-দিয়ে নীচে নামা সত্যিই বড় কষ্টকর। একটানা নীচে নামা নয়, মাঝে-মাঝে আবার ওপরেও উঠতে হয়। ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনাই একটু পরে হাঁপিয়ে গেলেন। অথচ কাকাবাবুর মুখে

কোনও পরিশ্রমের চিহ্ন নেই। অন্য কেউ নিষেধ করলেও কাকাবাবু শুনছেন না, আবার নিজের কোনও রকম অসুবিধে হলেও কারুকে জানাবেন না।

যে বড় গুহাটার সামনে মিংমাকে একজন মেরেছিল, সেখানে পৌঁছে আমি বললুম, 'কাকাবাবু, ঠিক এই জায়গায় সেই লোকটা—'

কাকাবাবু ডক্টর শাকসেনাকে ঘটনাটা শোনালেন।

উনি তো খুবই অবাক। আদিম গুহা-মানবের ছদ্মবেশ ? এ রকম উদ্ভট চিন্তা কার মাথায় আসতে পারে ?

কপাল কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে উনি বললেন, 'আর বোধহয় যাওয়া উচিত নয় আমাদের। অন্তত পুলিশ দু'জনকেও সঙ্গে আনলে হত !'

কাকাবাবু বললেন, 'এতখানি যখন নেমেছি, তখন সেই গুহাটা আমি একবার দেখে আসতে চাই।'

'শোনো রাজা, এখানে যদি কয়েকজন খুনে-গুণ্ডা লুকিয়ে থাকে, আমাদের পক্ষে তা বোঝার উপায় নেই। যদি হঠাৎ তারা আক্রমণ করে···আমি আর যেতে চাই না···তুমি আমাকে ভিতু ভাবতে পারো, কিন্তু আমার ওপর ওরা তাক্ করে আছে, পাঁচমারিতে একবার খুন করতে এসেছিল···'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনি ওপরে উঠে যান, সন্তু আর মিংমা আপনাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। সেই গুহাটা এখান থেকে কোন্ দিকে হবে আমায় বলে দিন, আর কত নম্বর, আমি একাই সেখানে যাব।'

'তুমি দেখছি আচ্ছা পাগল। চলো, এসেছি যখন সবাই যাই !'

আমরা পাহাড়ের অনেকখানি নীচের দিকে নেমে এসেছি। এখান থেকে ওঠবার সময় আমার আর মিংমার তেমন অসুবিধে না হলেও কাকাবাবু আর শাকসেনার তো প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এর থেকে তো পাহাড়ের উলটো দিকে ঘুরে এসে নীচে থেকে ওপরে ওঠা সোজা ছিল।

ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'এসে গেছি, ঐ যে ডাহিনা দিকে গাছের আড়ালে—'

সেদিকে কয়েক পা এগোতেই আমরা একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলুম। একজন মানুষ যেন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় উঁ উঁ করছে।

মিংমাই প্রথম দৌড়ে গেল সেদিকে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, 'সন্তু সাব্, ইধার আও।'

সেখানে গিয়ে আমি প্রায় আঁতকে উঠলুম। একটা বড় পাথরের নীচে আধখানা চাপা পড়ে আছে একজন মানুষ। সেই গুহামানব। মাটিতে অনেকখানি রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। লোকটা ওখানে গেল কী করে ? নিশ্চয়ই কেউ ওপর থেকে পাথরটা গড়িয়ে ফেলে ওকে চাপা দিয়েছে। কিংবা এমনি-এমনিও পাথরটা পড়তে পারে।

মিংমা আর আমি ঠেলে পাথরটা সরাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সেটা দারুণ

ভারী। এর মধ্যে কাকাবাবু আর শাকসেনাও পৌঁছে গিয়ে হাত লাগালেন। অনেক কষ্টে পাথরটাকে একটু মোটে নাড়ানো গেল, সেই অবস্থায় মিংমা লোকটির হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাইরে।

এবার ভাল করে দেখেও মনে হল, লোকটি যেন সত্যিই একজন আদ্যিকালের গুহামানব।

চিরঞ্জীব শাকসেনা হাঁটু মুড়ে লোকটির পাশে বসে পড়ে প্রথমে নাকে হাত দিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'বেঁচে আছে। এখনও চিকিৎসা করলে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি এখানে এসে না পড়তুম কেউ দেখতে পেত না ওকে, এই অবস্থায় মরে যেত।'

কাকাবাবু বললেন, 'কিন্তু লোকটা কে? ওর গোঁফ-দাড়ি আর মাথার চুল টেনে দেখুন তো? মনে হচ্ছে নকল।'

সত্যিই তাই। মিংমা ওর চুল ধরে টান দিতেই সবসুদ্ধু উঠে এল। দাড়ি-গোঁফেরও সেই অবস্থা।

চিরঞ্জীব শাকসেনা দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'তাজ্জব না তাজ্জব! এও কি বিশ্বাস করা যায়? এ যে ভিখু সিং!'

কাকাবাবু বললেন, 'ভিখু সিং? যে সব সময় আপনার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত?'

'হ্যাঁ। ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। সে এখানে কী করছে?'

'বুঝতে পারছেন না, ও এসেছিল গুপ্তধনের সন্ধানে। নিশ্চয়ই আপনাদের আলোচনা লুকিয়ে-চুরিয়ে শুনেছে!'

মাটিতে বসে পড়ে চিরঞ্জীব শাকসেনা বললেন, 'হা ভগওয়ান, গুপ্তধনের এত লোভ? এত বিশ্বাসী নোকর ভিখু সিং! হ্যাঁ, ও আমাদের কথাবার্তা তো শুনতেই পারে। আমার সঙ্গে ও ভীমবেঠকাতেও এসেছে কতবার।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করা দরকার। ওর কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওকে এতখানি ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে কী করে? বেশি নড়াচড়া করা উচিতও না!'

ভিখু সিংয়ের এখনও জ্ঞান ফেরেনি, আধা-অজ্ঞান অবস্থায় মাঝে-মাঝে আঃ আঃ শব্দ করছে। ওর একটা হাত আর পা প্রায় থেঁতলে গেছে মনে হয়। মাথাতেও চোট লেগেছে।

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, এক কাজ করা যাক। আপনার গাড়িটাকে যদি ঘুরিয়ে এই পাহাড়ের নীচে আনা যায়, তা হলে ওকে এখান থেকে সহজে নামিয়ে দেওয়া যাবে।'

ঠিক হল মিংমা ওপরে গিয়ে শাকসেনার লোকদের খবর দেবে। মিংমা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবে না বলে শাকসেনা একটা কাগজে লিখে দিলেন কয়েক লাইন, মিংমা সেটা নিয়ে চলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু, ও এরকম সেজেছে কেন?'

কাকাবাবু বললেন, 'ইতিহাসের পণ্ডিতের চাকর তো, শুনে-শুনে ও নিজেও ইতিহাসের অনেক কিছু জেনে গেছে। অনেক বইতে ছবি-টবিও দেখেছে নিশ্চয়ই। ভেবেছে গুহামানব সেজে থাকলে কেউ ওকে দেখলেই ভয়ে পালাবে।'

শাকসেনা বললেন, 'ঠিক বলেছ, ব্যাটা তাই ভেবেছিল নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় ও এখানে কিছু খোঁড়াখুঁড়িও করেছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'এর মধ্যেই একটা বেশ বড় গর্ত আমার চোখে পড়েছে। সেটা ওর একার পক্ষে খোঁড়া সম্ভব নয়। হয় ওর সঙ্গে আরও লোক ছিল, কিংবা যে বা যারা ওকে মেরেছে, তারাও গর্ত খুঁড়েছে।'

আমি বললুম, 'কাকাবাবু, বোধহয় ওরা গুপ্তধন পেয়ে গেছে, তাই ওকে ভাগ না দেবার জন্য ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'কথাটা কিন্তু সন্তু একেবারে মন্দ বলেনি, দাদা ? এখানে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু পাওয়া গেছে। নইলে, শুধু গুপ্তধন পাওয়া যেতে পারে, এই উড়ো কথাতেই তিনজন মানুষ খুন হয়ে গেল ? কিছু পাবার পরে লোভ বেড়েছে, এমনও হতে পারে। সন্তু, দ্যাখ্ তো এদিকে এরকম গর্ত ক'টা আছে ?'

আমি খানিকটা ঘুরে বেশ বড়-বড় পাঁচটা গর্ত দেখতে পেলুম। সবগুলোই এক-মানুষ, দু-মানুষ গভীর। একটা গর্তের মুখে বারুদের দাগ দেখে মনে হল, সেটা ডিনামাইট দিয়ে ওড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে দু-একটা গর্ত বেশ নতুন। একটাকে তো মনে হয় কালকেই খোঁড়া হয়েছে।

ফিরে এসে সে-কথা জানাতে কাকাবাবু বললেন, 'দেখলেন তো !'

শাকসেনা বললেন, 'কিন্তু ওরা সঙ্কেতের অর্থ জানবে কেমন করে ? তা তো জানতে পারে না। যদি মনোমোহন কারুকে না বলে।'

'মনোমোহন তা হলে জানত ?'

'মনোমোহন আমাকে পীড়াপীড়ি করেছিল ওর একটা অর্থ উদ্ধার করে দিতে, আমি স্টাডি করার তত সময় পাইনি তো, তবু একটা আন্দাজ করেছিলুম। মনোমোহন বলল, তাহলে সেই অনুযায়ী এক্সকাভেশান করা হোক। আমি বললুম, যদি গুপ্তধনের বেওপার হয়, তবে আগে সরকারকে সব জানাতে হবে। গুপ্তধন সাধারণত সরকারের সম্পত্তি হয়, অন্য কেউ নিতে পারে না। সরকারকে জানিয়ে কাজ শুরু করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই বলেছিলাম, আমি বিদেশ থেকে ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে।'

'নিশ্চয়ই মনোমোহন সেই কথা চেপে রাখতে পারেনি। অর্জুন শ্রীবাস্তব আর সুন্দরলালকেও বলেছিল কোনও এক সময়। সুন্দরলাল বলেছে তার ছেলেকে। আপনি বিদেশে ছিলেন, এই চারজনের কোনও একজনের কাছ থেকে শুনে ফেলেছে বাইরের কোনও লোক। তারপরই শুরু হয়েছে

গণ্ডগোল। আপনাকে বলা হয়নি, এই পাহাড়ে আরও একজন ঘুরছিল কাল রাত্রে, আমরা দেখেছি। সে হল মনোমোহনের চাকর, যার জিভ কেটে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম ও এসেছিল প্রতিশোধের জন্য, কিন্তু এমনও হতে পারে, ও-ও এসেছে গুপ্তধনের লোভে।'

'বাপ রে, বাপ। আর বলো না, আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। মানুষের এত লোভ ! ভিখু সিং, আমার এত বিশ্বাসের লোক ছিল…সে বেওকুফটা পর্যন্ত এখানে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে…'

কাকাবাবু বললেন, 'চলুন দাদা, ততক্ষণ গুহাটার ভেতরে একটু দেখে আসি।'

এই গুহাতেও একটু উঁচুতে, কয়েকটা পাথরের ওপর পা দিয়ে সিঁড়ির মতন উঠতে হয়। কাকাবাবু কারুর সাহায্য না নিয়ে উঠে পড়লেন ওপরে।

গুহাটা চৌকো ধরনের, প্রায় একটা ঘরের মতন। খাট-বিছানা পেতে এখানে বেশ ভালভাবেই থাকা যায়। কোনও পলাতক রাজার পক্ষে এখানে আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে সব দেয়ালগুলো দেখতে লাগলেন। কোনও দেয়ালেই কোনও ছবি নেই। ছবি দেখতে পাওয়া গেল ছাদে। পাশাপাশি নানা ভঙ্গির অনেকগুলো মানুষ। অন্য গুহাগুলোরই মতন, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দমের মতন চেহারার মানুষ। আমি সংখ্যা গুনতে লাগলুম।

চিরঞ্জীব শাকসেনা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ইস্ ছি ছি ছি ছি ছি ! কী অন্যায় ! কী অন্যায় ! ভ্যাণ্ডাল্স ! এদের ফাঁসি হওয়া উচিত।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে ?'

'ঐ দ্যাখো ! দেখছ, ভাঙা জায়গা ? ছেনি কিংবা বাটালি দিয়ে কেউ ওখানে পাথর ভেঙে নিয়েছে।'

'ওখানে ছবি ছিল ?'

'আলবাত !'

'কেউ ছবিগুলো কপি করে নিয়ে তারপর আসল ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছে। যাতে আর কেউ এখান থেকে কোনও সূত্র না পায়।'

'ছি ছি ছি, এরকম মূল্যবান ছবি ! দেশের সম্পদ !'

আমি ততক্ষণে গুনে ফেলেছি। এখন ছবি আছে মোট সাতাশটা মানুষের। তার পাশে পাথরের চলটা উঠে গেছে অনেকখানি।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আগে কি এখানে মোট চল্লিশ জন মানুষের ছবি ছিল ?'

চিরঞ্জীব শাকসেনা বললেন, 'না। সেইটাই তো মজা। সাঙ্কেতিক ভাষায় চল্লিশজন মানুষের উল্লেখ থাকলেও এখানে ছবি ছিল মোট একশো পঁয়তাল্লিশটা। আমরা খুব শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস এনেও দেখেছি, তার

পাশে আরও ছবি মুছে যাওয়ার চিহ্ন ছিল।'

'আচ্ছা দাদা, কতগুলো এরকম মানুষের ছবি দেখে কী করে একটা ভাষা পড়া যায় ?'

'ওটা ছিল মনোমোহনের ব্যাপার। তবে দেখছ তো, প্রত্যেকটা ছবির হাত-পায়ের ভঙ্গি আলাদা ? ঐ হাত-পায়ের ওঠা-নামার মধ্যেই একটা ভাষা থাকতে পারে। অনেকটা সিমাফোর-এর মতন। তুমি নিশ্চয়ই সিমাফোর কী তা জানো, আমি এই বাচ্চাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'শুনো সন্তু বেটা, সিমাফোর হচ্ছে একটা কথা-না-বলা ভাষা। অনেকটা তোমার টেলিগ্রাফের টরেটক্কার মতন। তুমি এখানে পোস্ট অফিসে বসে টরেটক্কা করো, বহুত দূরে আর একজন সেই ভাষা বুঝে যাবে। এই টরেটক্কাকে বলে মর্স কোড। আর সিমাফোর তারও আগের। মনে করো, তুমি একটা দ্বীপে একা বিপদে পড়ে আছ, দূর দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছে। তুমি চিৎকার করলেও তো সমুদ্রের আওয়াজের জন্য তোমার গলা কেউ শুনতে পাবে না। তখন যদি তুমি সিমাফোর কোড জানো, তাহলে একটা পতাকা কিংবা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঠিক-ঠাক নাড়লে জাহাজের ক্যাপ্টেন বুঝতে পেরে যাবে। সামনের দিকে দু'বার নাড়লে বুঝবে খাদ্য, আর মাথার ওপর দু'বার ঘোরালে বুঝবে হিংস্র প্রাণী, এই রকম, বুঝলে তো ?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এই গুহাবাসীরা সিমাফোর জানত ?'

'সিমাফোর ঠিক নয়, ওরা নিজস্ব অন্য একটা ভাষা তৈরি করে নিয়েছিল। মনোমোহন তার পাঠ উদ্ধার করেছে।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মূল ছবিগুলোর সব ছবি তোলা আছে আপনার কাছে ?'

'আমার কাছে নেই, তবে মনোমোহনের কাছে অনেক রকম এই ছবি তোলা ছিল।'

'সবাই জানে, যে-তিনজন খুন হয়েছে, তাদের কিছু চুরি যায়নি। কিন্তু মনোমোহনের ঘর থেকে এই ছবিগুলো উধাও হয়ে গেছে কি না পুলিশ নিশ্চয়ই সে খোঁজ নেয়নি ?'

'ঠিক বলেছ ! পুলিশের একথা মাথাতেই আসবে না।'

'চলুন। এখানে আর কিছু দেখবার নেই। বাইরে যাই।'

বাইরে গিয়ে দেখলুম, ভিখু সিং চোখ মেলেছে, কোনও রকমে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। চিরঞ্জীব শাকসেনাকে দেখে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, ওকে জিজ্ঞেস করুন, ওকে যে মেরেছে তাকে ও দেখতে পেয়েছিল কি না ?'

কিন্তু ভিখু সিং কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু কেঁদেই চলল।

চিরঞ্জীব শাকসেনা বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর্। তোর ভয়

নেই, তোকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা ঘটেছে নিশ্চয়ই কাল রাত্তিরে। ওপরে বসে পাহারা দিয়ে কোনও লাভ হল না। ওপরের গাড়ির রাস্তা দিয়ে না এসে যে-কেউ পাহাড়ের নীচে দিয়ে এদিকে আসতে পারে।'

একটু পরেই তলা থেকে মিংমার গলা পেলাম, "আংক্‌ল সাব! আংক্‌ল সাব।'

বুঝলাম, গাড়ি এসে গেছে এদিকে।

মিংমা আর পুলিশ দু'জন ওপরে উঠে এল জঙ্গল ঠেলে। তারা তিনজনে ধরাধরি করে ভিখু সিংকে নামিয়ে নিয়ে চলল।

চিরঞ্জীব শাকসেনা কাকাবাবুকে বললেন, 'রাজা, তুমিও চলো আমার সঙ্গে। এখানে থেকে আর কী করবে।'

ভেবেছিলুম কাকাবাবু সে-কথা শুনবেন না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কাকাবাবু তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, চলুন। এখানে আর থেকে কী হবে। এখানে সত্যিই যদি গুপ্তধন থাকে, তবে তা উদ্ধার বা রক্ষা করবার দায়িত্ব সরকারের, আমাদের তো নয়।'

॥ নয় ॥

আমাদের খাটিয়া আর সব জিনিসপত্তর পড়ে রইল পাহাড়ের ওপরে, সাধুবাবার আশ্রমে। আমরা ফিরে এলুম ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনার গাড়িতে।

মিংমা আর আমি নেমে গেলুম আরেরা কলোনির কাছে। কাকাবাবু যাবেন ভিখু সিংকে নিয়ে হাসপাতালে।

ছোড়দি তো আমাদের ফিরতে দেখে অবাক। এত তাড়াতাড়ি আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শেষ হয়ে যাওয়ায় আমিও বেশ একটু নিরাশ বোধ করছি। ভেবেছিলুম ভীমবেঠকা পাহাড়ে অন্তত দিন সাতেক থাকা হবে। জলের কলসি-টলসি কেনা হল, কোনও কাজে লাগল না। বেশ লাগছিল কিন্তু ওখানে থাকতে।

তাছাড়া খুনিরাও তো ধরা পড়ল না!

রত্নেশদা, ধীরেনদা, নিপুদারা সবাই অফিসে। দীপু আর আলোও স্কুলে গেছে। দুপুরে কিছু করার নেই, আমি তাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমোলুম। মিংমা ঘুমোয় না, ও সারা দুপুর খেলা করল কুকুরটাকে নিয়ে।

কাকাবাবু ফিরলেন বিকেলে। উশকো-খুশকো চুল, ক্লান্ত চেহারা। মনে হয় সারাদিন কিছুই খাননি। সঙ্গে একটা বিরাট ব্যাগ ভর্তি অনেক রকম কাগজ আর বইপত্তর।

ছোড়দিকে বললেন, 'কিছু খাবার-টাবার তৈরি করো তো, আমি স্নানটা করে আসি।'

বিকেলের দিকে খবর পেয়ে ধীরেনদা ছুটে এলেন কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, কাকাবাবু, খুনি ধরা পড়ল না?'

কাকাবাবু বললেন, 'খুনি ধরা তো আমার কাজ নয়। ভীমবেঠ্‌কার সঙ্গে যে ঐ তিনটে খুনের সম্পর্ক আছে, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। এখন পুলিশ খুনিদের খুঁজে বার করবে। খুনের মোটিভ বা কারণটা জানা গেলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।'

ধীরেনদা বললেন, 'যাঃ। আমরা খুব আশা করেছিলুম আপনিই ওদের শাস্তি দেবেন।'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'নাঃ, এবারে আর তা হল না। এক হিসেবে ধরতে পারো, এবারে আমার হার হল। ঐ সব সাংঘাতিক খুনির সঙ্গে আমি পারব কেন! পুলিশই পারতে পারে।'

ধীরেনদা বললেন, 'এখানকার পুলিশ···আমার অত বিশ্বাস নেই।'

'কাল থেকে ভীমবেঠ্‌কার ঐ গুহাগুলোও পুলিশ পাহারায় থাকবে, যাতে ওখানে কেউ আর খোঁড়াখুঁড়ি করতে না পারে। সে ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।'

'কাল থেকে? যদি আজ রাত্তিরেই ওরা এসে কিছু করে যায়?'

'সেটাও সরকারের দায়িত্ব। তবে···'

কাকাবাবু কথা বলতে বলতে থেমে চুপ করে রইলেন। একটু ভেবে আবার বললেন, 'তবে এমনও হতে পারে, কাল থেকে পুলিশ হয়তো পুরো ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ই ঘিরে রাখবে, কোনও লোককেই যেতে দেবে না। আমাদের জিনিসপত্রের কী হবে? সেগুলো আনব কী করে? বিশেষত আমার ট্রান্সমিশান সেট্‌টাও ওখানে পড়ে আছে।'

'আপনাকে নিশ্চয়ই যেতে দেবে। তা কখনও হয়?'

'বলা তো যায় না! বরং এক কাজ করা যাক, এই তো সবে সন্ধে হচ্ছে, এখনই গিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আসা যাক। আমার ট্রান্সমিশান সেট্‌টা হারালে খুব মুশকিল হবে!'

'সেটা এমনি ফেলে এসেছেন?'

'সাধুবাবার কাছে জমা দিয়ে এসেছি। ধীরেন, তোমার গাড়ির ড্রাইভার আছে না?'

'আমিই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না, না, তার দরকার নেই। তোমাকে যেতে হবে না। ড্রাইভার থাকলেই হবে, আমরা যাব আর আসব।'

'তা হয় না, কাকাবাবু, এই রাত্তিরে আপনাকে আমরা একলা যেতে দেব না। আমি যাবই আপনার সঙ্গে।'

'ধীরেন, তুমি জানো না। ঐ সন্তুকে জিগ্যেস করো, আমি একবার না বললে

আর হ্যাঁ হয় না। আমি বলছি, তোমার যাবার দরকার নেই।'

'আপনি কেন একথা বলছেন, আমি জানি। আপনি ভাবছেন, আমার যদি কোনও বিপদ হয়, তাহলে আমার স্ত্রী আর ছেলেরা আপনাকে দোষ দেবে! যে ড্রাইভার বেচারা যাবে, তারও স্ত্রী আছে, দুটো বাচ্চা আছে। তার বিপদ হলেও সেই একই ব্যাপার। তা ছাড়া আপনি না থাকলেও আমি মাঝে-মাঝে এরকম বিপজ্জনক ঝুঁকি নিই। চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই, বেরিয়ে পড়া যাক।'

'তুমি যাবেই বলছ? বেশ! তুমি ফায়ার আর্মস চালাতে পারো? তোমার আছে কিছু?'

'এক কালে আমার শিকারের শখ ছিল। কিন্তু এখন তো বন্দুক পিস্তল কিছু নেই আমার। একটা বড় ছুরি আছে। ওঃ হ্যাঁ, রত্নেশের তো রাইফেল আছে, সেটা নিতে পারি?'

'তাই নাও। একটা কিছু হাতিয়ার সঙ্গে রাখা ভাল।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কাকাবাবু কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন একটা ব্যাগ। ভীমবেঠকায় পৌঁছবার আগেই নেমে এল অন্ধকার। এখানকার রাস্তা অবশ্য অন্য অনেক পাহাড়ি রাস্তার মতন তেমন বিপজ্জনক নয়। হেডলাইট জ্বেলে ধীরেনদা সাবধানে চালাতে লাগলেন গাড়ি।

কালকের মতন আজও সাধুবাবা চোখ বুজে ধ্যানে বসেছেন।

কাকাবাবু বললেন, এখন ওঁকে ডাকা ঠিক হবে না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।'

আশ্রমের পেছন দিকে আমাদের গোটানো খাটগুলো পেয়ে গেলুম। কিন্তু স্টোভ আর অন্যান্য জিনিসপত্র কিছু নেই। সেগুলো হয়তো সাধুবাবা আশ্রমের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু সাধুবাবার অনুমতি না নিয়ে আশ্রমের মধ্যে ঢোকা উচিত নয়।

আমরা সকালে চলে যাওয়ার সময় সাধুবাবাকে একটা খবরও দিয়ে যেতে পারিনি। উনি কী ভেবেছেন, কে জানে!

নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম এদিক ওদিক। আজ আর তেমন অন্ধকার নয়, আকাশ বেশ পরিষ্কার।

ধীরেনদা চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলেন, 'সাধুজির ধ্যান কখন ভাঙবে? যদি সারারাত উনি ঐরকম বসে থাকেন?'

ধীরেনদা এই কথা বলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কালকের মতন গোরুটা দু'বার ডেকে উঠল, হাম্‌বা! হাম্‌বা!

তারপরই সাধুবাবা বললেন, 'ব্যোম্ ভোলা, মহাদেও, শঙ্করজি!'

আশ্চর্য! সত্যিই তো দেখা যাচ্ছে, এই গোরুটা একদম ঠিক ঘড়ির মতন।

কাকাবাবু বললেন, 'নমস্কার, সাধুজি!'

সাধুজি বললেন, 'রায়চৌধুরীবাবু, আপলোগ অচানক চলে গ্যায়ে ম্যায় শোচ্‌তা হুঁ...'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে গিয়েছিলুম, তাই আপনাকে আর খবর দিতে পারিনি। আমার জিনিসপত্র...'

সাধুবাবা জানালেন যে, সেগুলো আশ্রমের মধ্যে আছে। ভেতরে ঢুকে তিনি একে-একে সবই এনে দিলেন।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সাধুজি, আমরা চলে যাবার পর আর কেউ এসেছিল ? আপনার নজরে কিছু পড়েছে ?'

উনি দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

'জানেন, সাধুজি, এই পাহাড়ে গুপ্তধনের হদিস পাওয়া গেছে ?'

সাধুবাবা হিন্দিতে বললেন যে, গুপ্তধন ? তা বেশ তো ! তাতে ওঁর কিছু যায় আসে না। ওঁর তো কোনও জিনিসে প্রয়োজন নেই।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার, সাধুজি। আবার পরে এলে দেখা হবে।'

মালপত্রগুলো সব নিয়ে আসা হল গাড়ির কাছে। ওপরের কেরিয়ারে বাঁধা হল খাটগুলো। আমরা গাড়িতে উঠে বসেছি, কাকাবাবু তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। উনি যেন শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছেন পাহাড়টাকে। কিন্তু

আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখবার নেই অবশ্য। অন্ধকার গুহাগুলোর দিকে তাকিয়ে আজও আমার গা ছম্‌ছম্‌ করছে।

কাকাবাবু বললেন, 'এত দূর এলুম যখন, একবার গুপ্তধনের খোঁজ করে যাব না ?'

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকাবাবু, আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, এখানে গুপ্তধন আছে ? আমি কিন্তু এখনও ঠিক...'

'তোমাকে কেন আনতে চাইনি জানো ধীরেন ? গুপ্তধন পেলে তোমাকেও ভাগ দিতে হবে, সেই জন্য !'

আমি আর ধীরেনদা দুজনেই অবাক। কাকাবাবুর মুখে এরকম কথা আমি কখনও শুনিনি। উনি গুপ্তধনের জন্য লোভ করবেন, তা হতেই পারে না।

কাকাবাবু বললেন, 'মিংমা, চলো তো আমরা একবার নীচের সেই গুহাটা থেকে ঘুরে আসি। ধীরেন আর সন্তু এখানে অপেক্ষা করুক।'

ধীরেনদা বললেন, 'আপনি এই অন্ধকারের মধ্যে এতখানি নীচে নামবেন ? এ যে অসম্ভব ব্যাপার।'

'অসম্ভব বলে আবার কিছু আছে নাকি ? ছবির ভাষার যে সঙ্কেত তা আমি বুঝতে পেরে গেছি। সেটা সত্যি কিনা আজই আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কাল থেকে পুলিশ পাহারা দেবে...তোমরা দুজনে এখানে

অপেক্ষা করো বরং…'

ধীরেনদা কাকাবাবুকে থামাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কাকাবাবু যাবেনই গুপ্তধনের সন্ধানে। তাহলে ধীরেনদা আর আমারও এখানে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

এবার আমার সত্যিকারের ভয় করতে লাগল। হোঁচট খেয়ে পড়া কিংবা নীচে গড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তো আছেই। তা ছাড়া কে কোথায় লুকিয়ে আছে, ঠিক নেই। যে-কেউ পাথর ছুঁড়ে কিংবা গুলি করে আমাদের মেরে ফেলতে পারে।

ঠিক হল সবাই যাব, একসঙ্গে, পরস্পরকে ছুঁয়ে থেকে। আমার আর মিংমার হাতে টর্চ, সামনে রাইফেল হাতে ধীরেনদা, একদম পেছনে রিভলভার হাতে কাকাবাবু!

নামতে নামতে এক-একবার কোনও শব্দ শুনেই চমকে উঠছি আমরা। হয়তো আমাদেরই পায়ের শব্দ কিংবা পায়ের ধাক্কায় ছিটকে-যাওয়া কোনও নুড়ি। মাথার ওপর দিয়ে শান্-শান্ করে উড়ে গেল একদল বাদুড়। এই অন্ধকারের মধ্যে ক্রাচে ভর দিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে নামা যে কত শক্ত, তা আমরা বুঝব কী করে! দু'পায়ে ভর দেওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই হড়কে যাচ্ছে আমাদের পা, কাকাবাবু কিন্তু একবারও পিছলে গেলেন না।

বেশি নীচে নামতে হল না। মাঝামাঝি এসে এক জায়গায় কাকাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'দ্যাখ তো, সন্তু, সামনের গুহাটার নম্বর কত?'

কোনও-কোনও গুহার বাইরে আলকাতরা দিয়ে নম্বর লেখা আছে বটে। এখানে একটা গুহার বাইরে লেখা 'আর এস্ ফিফ্‌টি টু'।

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে দ্যাখ আর এস্ ফিফটি ফোরটা কাছাকাছি হবে।'

টর্চের আলো ঘোরাতেই এক জায়গায় দুটো আগুনের মতন চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

আমি চমকে উঠতেই ধীরেনদা বললেন, ওটা নিশ্চয়ই কোনও পাখি। হ্যাঁ, এই তো প্যাঁচাটা এত আলো দেখেও নড়ে-চড়েনি। একদৃষ্টে চেয়েছিল আমাদের দিকে। আমি আর মিংমা হুস্-হাস্ করতে অনিচ্ছার সঙ্গে উড়ে গেল। গুহাটার মধ্যে খুব ভাল করে দেখলুম যে, আর কিছু নেই। তারপর ঢুকে পড়লুম সেটার মধ্যে।

এক দিকের দেয়ালে দেখলুম, পর পর কয়েকটা মানুষের ছবি, আর দুটো জন্তুর, খুব সম্ভবত মোষের।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কাকাবাবু, ছবি আছে।'

'ক'টা মানুষ?'

'তেরোটা।'

'অন্য দেয়াল দ্যাখ।'

আরেকটি দেয়ালেও এক সার মানুষ রয়েছে। এখানে আছে পাঁচটা। পেছন দিকের দেয়ালে নটা।

সে-কথা কাকাবাবুকে জানাতে উনি বললেন, ভাল করে ছাদটাও দেখতে।

'হ্যাঁ, ছাদেও ছবি আছে অনেকগুলো। এখানেও তেরোটা।'

কাকাবাবু বললেন, 'তাহলে কত হল? চল্লিশ না? ঠিক আছে এবারে বেরিয়ে আয়।'

শরীরটা একবার কেঁপে উঠল আমার। চল্লিশ মানুষ! গুপ্তধনের সংকেতে চল্লিশজনের উল্লেখ আছে। তা হলে কি এখানেই আছে সেই গুপ্তধন?

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে টর্চের আলোয় দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মিলেছে। আমি দুপুরে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখে এসেছি, কোন্ গুহায় কত ছবি আছে, তার লিস্ট আছে সেখানে। দুটো মোষের ছবিও দেখিসনি?'

'হ্যাঁ। দেখেছি, কাকাবাবু!'

'এবার দ্যাখ তো, পাশের গুহাটায় কী আছে?'

সে-গুহাটায় ঢুকে দেখলুম, সেখানে আর কোনও ছবি নেই, শুধু দুটো মোষের ছবি।

কাকাবাবু নিজের ঝোলা-ব্যাগ থেকে একটা শাবল বার করে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আর একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না! এই দুটো গুহার মাঝখানেই আছে সেই গুপ্তধন। চটপট গর্ত করে দেখতে হবে।'

প্রথমে ধীরেনদা চেষ্টা করলেন শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়বার। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কিছু মাটিমেশানো জায়গাও আছে। সেখানে ছাড়া অন্য জায়গায় শুধু শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়া প্রায় অসম্ভব। ধীরেনদা খানিকটা খুঁড়বার পর মিংমা ওঁর হাত থেকে শাবলটা নিয়ে জোরে-জোরে গর্ত খুঁড়তে লাগল। বেশ কিছুটা গর্ত করার পর ঠং-ঠং শব্দ হতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'দাঁড়াও, আমি দেখছি।'

তিনি গর্তটার পাশে বসে পড়ে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। কিছুই নেই, শুধু কঠিন পাথর।

কাকাবাবু দ্বিতীয়টাও পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'আর-একটা খুঁড়ে দ্যাখো, কিছু এখানে থাকতে বাধ্য।'

তৃতীয় গর্তটা অনেকখানি গভীর হল। এক সময় কাকাবাবু মিংমাকে বললেন, 'ব্যস, আর না। সরে এসো, আমি ভেতরটা খুঁজে দেখছি। সবাই টর্চ নিভিয়ে দাও তো একবার, কিসের যেন শব্দ পেলাম।'

বড়-বড় পাথরের ফাঁকে আকাশের আলো আসে না, টর্চ নেভাতেই আমরা ডুবে গেলাম ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে। সবাই কান খাড়া করে রইলাম।

দূরে যেন শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ হল। কেউ যেন হাঁটছে। তবে আওয়াজটা এত ক্ষীণ যে, মনে হয়, যে-ই হাঁটুক, সে আছে বেশ দূরে, কিংবা শেয়াল-টেয়ালের মতন ছোট কোনও প্রাণী।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাকাবাবু ফিসফিসিয়ে বললেন, 'একটু টর্চ জ্বালো একবার। মনে হয় কী যেন পেয়েছি!'

কাকাবাবু হাতটা তুললেন, তাতে একটা ধাতুর মূর্তি। প্রায় এক-হাত লম্বা একটা মানুষের মতন।

কাকাবাবু দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'এই তো, সোনার মূর্তি। আমার ধারণা এরকম চল্লিশটা মূর্তি এখানে পোঁতা আছে। এর এক-একটার দাম কত হবে বলো তো, ধীরেন?'

ধীরেনদা এত অবাক হয়ে গেছেন যে, কথাই বলতে পারছেন না। সত্যিই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি আমরা। এই তো দেখা যাচ্ছে একটা কত বড় সোনার মূর্তি। টর্চের আলোয় গা'টা ঝকঝক করছে।

কাকাবাবু বললেন,'অন্তত লাখ দু'এক টাকা এই একটারই দাম হবে। যথেষ্ট হয়েছে, চলো এবার। বেশি লোভ করা ভাল নয়। আমরা বে-আইনি কাজ করছি। তা ছাড়া যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ হতে পারে।'

মিংমাকে তিনি বললেন চটপট গর্তগুলো বুজিয়ে দিতে। তারপর আমরা ফেরার পথ ধরলুম। এত জোরে উঠতে লাগলুম যেন কেউ আমাদের তাড়া করে আসছে। গুপ্তধন নিয়ে পালাচ্ছি বলে ধক্‌ধক্‌ করছে বুকের মধ্যে।

বিনা বিপদেই আমরা পৌঁছে গেলুম ওপরের রাস্তার দিকটায়। কাছে আসবার পর ভয় কেটে গেল। অন্ধকার গুহাগুলোর আশেপাশে যে-কেউ আমাদের আক্রমণ করতে পারত। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, আমাদের কাছে একটা রাইফেল আর রিভলভার আছে।

গাড়িটাতে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলুম খানিকক্ষণ। তারপর কাকাবাবুর কাছ থেকে মূর্তিটা নিয়ে সবাই দেখলুম ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। মূর্তিটা বেশ ভারী। এতকাল মাটির তলায় ছিল, কিন্তু একটুও ভাঙেনি, শুধু রংটা একটু কালো হয়ে গেছে। তবু বোঝা যায় জিনিসটা সোনার।

ধীরেনদা বললেন, 'এবার তা হলে কেটে পড়ি আমরা?'

কাকাবাবু বললেন, 'তোমাদের খিদে পায়নি? এত পরিশ্রম হল? আমার তো খিদেয় পেট জ্বলছে।'

ধীরেনদা বললেন, 'ওবায়দুল্লাগঞ্জে হোটেল খোলা থাকতে পারে। চলুন, সেখানে খেয়ে নেবেন।'

গাড়ির সামনের ঘাসের ওপর বসে পড়ে কাকাবাবু ক্রাচ দুটো এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, 'ভাবছি পথে কোনও বিপদ হবে কি না!

পাহাড় থেকে নামবার পথে যদি কেউ আমাদের গাড়ি আটকায় ? একটা পাথরের চাঁই গড়িয়ে দেয় ? পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলের আড়াল থেকে কেউ যদি আমাদের দেখে থাকে··· আমাদের সঙ্গে এত দামি জিনিস···। তার চেয়ে এক কাজ করলে তো হয়, রাত্তিরটা আমরা এখানেই থেকে যাই, সঙ্গে তো স্টোভ আর চাল-ডাল আছেই, মিংমা খিঁচুড়ি রাঁধবে।'

ধীরেনদা বললেন, 'সারা রাত এখানে থাকবেন ?'

'কেন, অসুবিধের কী আছে ?'

'আমি যদি খুব জোর গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাই ?'

'তাতে বিপদ আরও বাড়বে। রাস্তার মাঝখানে পাথর ফেলে রাখলে আমাদের গাড়ি উলটে যাবে ! তার চেয়ে বরং এখানে সারা রাত জেগে পাহারা দেব। সেই তো ভাল !'

'বাড়িতে কিছু বলে আসিনি। ওরা চিন্তা করবে। ভেবেছিলুম, রাত দশটার মধ্যে ফিরব !'

'এখনই তো দশটা বেজে গেছে। তোমাদের বাড়িতে খবর দেবার ব্যবস্থা আমি করছি। থানায় খবর দিচ্ছি, ওরা তোমার বাড়িতে জানিয়ে দেবে।'

কাকাবাবু ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশান সেটটা খুললেন। সেটাতে কড়কড় শব্দ হতেই উনি বললেন, 'রায়চৌধুরী স্পীকিং, ফ্রম দা ভীমবেঠ্‌কা হিলস...রায়চৌধুরী...'

মিংমা এই সব কথাবার্তা শুনে গাড়ি থেকে স্টোভটা বার করে জ্বেলে ফেলেছে। কাকাবাবু বললেন, 'আগে একটু চা করো। তারপর খিঁচুড়ি-টিচুড়ি হবে।'

জলের কলসিগুলো কিন্তু সাধুবাবার আশ্রমের কাছে রয়ে গেছে।

ধীরেনদা বললেন, 'চলো সন্তু, তুমি আর আমি ধরাধরি করে একটা কলসি এখানে নিয়ে আসি। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে, আমাদের মুনলিট পিকনিক হবে।'

আমি বললুম, 'ধীরেনদা, আপনার একবারও বুক কাঁপেনি ? আমার তো এখনও বুকের মধ্যে দুম্-দুম্ হচ্ছে। গুপ্তধনের জন্য গর্ত খোঁড়ার সময় সব সময় মনে হচ্ছিল, কারা যেন লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের দেখছে। এই বুঝি গুলি চালাল।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছিল ? আমার এখন কী মনে হচ্ছে জানো ? রাত্তিরে যখন থেকেই যাওয়া হল, তখন আর-একবার ওখানে গেলে হয় না ?'

'আবার যেতে চান ?'

'আরও কত জিনিস আছে দেখতুম ! সত্যি, গুপ্তধনের একটা সাঙ্ঘাতিক নেশা আছে।'

'যারা গুপ্তধন খুঁজতে যায়, তারা কেউ সাধারণত প্রাণে বাঁচে না।'

'এর মধ্যে তিনজন খুন হয়েছে। কে জানে, তারাও আলাদাভাবে এখানে গুপ্তধনের জন্য এসেছিল কি না ! এসে হয়তো কিছু পেয়েওছিল, খুন হয়েছে সেই জন্য !'

'তবু আপনি বলছেন, আবার যাব !'

'তবু ইচ্ছে করছে যেতে। তা হলেই বুঝে দ্যাখো কী রকম নেশা !'

জলের কল্‌সিগুলো বাইরেই পড়ে আছে। সাধুবাবা ঘুমোতে গেছেন। আমি আর ধীরেনদা একটা কল্‌সি দু'জনে ধরে তুললাম।

সেটাকে ধরাধরি করে কিছুটা নিয়ে এসেছি, এমন সময় কোথায় যেন প্রচণ্ড জোরে দুম্‌-দুম্‌ করে দুটো শব্দ হল। ঠিক যেন কামানের আওয়াজ কিংবা বোমা ফাটার মতন।

দু'জনে এতই চমকে গিয়েছিলুম যে, হাত থেকে পড়ে গেল কল্‌সিটা। দু'জনেরই মনে হল, কাকাবাবুর কোনও বিপদ হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটলুম গাড়ির দিকে।

কাকাবাবুও আমাদের চিন্তায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমরা এসে পৌঁছবার পর কাকাবাবু বললেন, 'যাক, তোমরা এসেছ, নিশ্চিন্ত ! মিংমা, তোমার আর খিঁচুড়ি রাঁধতে হবে না, আমরা একটু বাদে ফিরে যাব।'

হাতের সোনার মূর্তিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এটারও আর কোনও দরকার নেই।'

ধীরেনদা বললেন, 'কী হল ব্যাপারটা ?'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'ওটা সোনার মূর্তি নয়। সাধারণ লোহার মূর্তির ওপর পেতলের পাত মোড়া !'

ধীরেনদা চোখ একেবারে কপালে তুলে বললেন, 'আপনি ঐ গুপ্তধনের জায়গায় এই লোহার মূর্তি পেয়েছেন ? গর্তের মধ্যে ?'

কাকাবাবু হাসলেন।

'মূর্তিটা গর্তে ছিল না। ছিল আমার ঝোলায়। অন্ধকারের মধ্যে গর্তে লুকিয়ে তারপর তোমাদের তুলে দেখিয়েছি। ওটা গুপ্তধনের জায়গাও না, ওখানে আমি দুটো ফাঁদ পেতে রাখতে গিয়েছিলাম। আমার কায়দাটা কাজে লেগে গেছে দেখছি। এক্ষুনি দেখতে পাবে। ওরে মিংমা, চা-টা অন্তত তৈরি করে ফ্যাল্‌।'

মিংমা ফ্ল্যাস্কের জল নিয়ে সস্‌প্যানে চাপিয়ে দিল।

ধীরেনদা মাটি থেকে মূর্তিটা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমার আগেই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি সে-রকম কথা একবার ভাবিওনি। গর্তের মধ্য থেকে বেরুল···কাকাবাবু, আমি কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না এখনও। বোমা ফাটল কোথায় ? কারা ফাটাল ?'

'আমি ফাটালাম !'

'আপনি ?'

'বোসো, বলছি। আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম যে, যারা গুপ্তধনের লোভে মানুষ খুন করেছে, তারা আজ রাতেই কিছু একটা হেস্তনেস্ত করার চেষ্টা করবে। কাল থেকে পুলিশ-পাহারা বসবে। আজ রাতে, অন্ধকারের মধ্যে যদি ঐ গুহা আর জঙ্গলে আট-দশটা লোকও লুকিয়ে থাকে, তাহলেও তাদের ধরা সম্ভব নয়। অন্ধকারে খুঁজে পাবে কী করে ? তাই আমি একটা ফাঁদ পাতলুম। অনেক চেষ্টা করে আজ দুপুরে এখানকার আর্মির কাছ থেকে আমি দুটো মিথেন বোমা জোগাড় করেছি। কোনও লোহার জিনিস দিয়ে ছুঁলেই এই বোমা ফেটে যায়। তখন দুশো ফুটের মধ্যে যত মানুষ থাকবে সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে। যেখানে আমরা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলাম, ওখানে গুপ্তধন থাকার কোনও কথাই নয়। তবু ওখানে গর্ত খুঁড়িয়ে একটাতে এই রকম আর-একটা পেতলের মূর্তি, আর দুটোতে দুটো বোমা আমি লুকিয়ে রেখে এসেছি তখন। জানতুম, আড়াল থেকে কেউ-না-কেউ আমাদের লক্ষ করবেই। ঠিক সেটাই হয়েছে। ঐ শোনো !'

এবার জঙ্গলে শোনা গেল অনেক হুইশেলের শব্দ, মানুষের গলার আওয়াজ। আর বড়-বড় ফ্লাশলাইটের আলো ঝলসে উঠল। কৌতূহল সামলাতে না-পেরে আমরাও এগিয়ে গেলুম খানিকটা।

প্রায় কুড়িজন পুলিশ মিলে বয়ে নিয়ে এল আটজন ঘুমন্ত বন্দীকে। আমি

চমকে উঠলুম তাদের মধ্যে প্রথমেই সাধুবাবাকে দেখে।

ধীরেনদা বললেন, 'ইশ, সাধুবাবা পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারেননি !'

কাকাবাবু বললেন, 'ইনি আসল সাধুবাবা নন। আগের বার এসে দেখেছিলাম দু'জন সাধুকে। ও ছিল চেলা। আসল বড় সাধুবাবা কাশীতে তীর্থ করতে গেছেন।'

পুলিশের অফিসার বললেন, 'আরও তিনজনকে চিনতে পারা গেছে। একজন মিউজিয়ামের দারোয়ান, একজন পুলিশের লোক, আর এই যে গোঁফওয়ালাটিকে দেখছেন, এ সেই কুখ্যাত ডাকাত রামকুমার পাধি, খুনগুলো সম্ভবত এ-ই করেছে। ভোজালি দিয়ে মুণ্ডু কেটে ফেলা এর স্টাইল। ওর নামে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা আছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আর সবাইকেও চিনতে পারবেন ঠিকই। সবই এক জাতের পাখি। এদের একটু চাপ দিলেই জানতে পারবেন, কোথায় এরা সুন্দরলালের ছেলে প্রেমকিশোরকে আটকে রেখেছে। সম্ভবত প্রেমকিশোরের মুখ থেকেই এরা প্রথমে ব্যাপারটা জানতে পারে। তার কী সাঙ্ঘাতিক পরিণতি !'

পুলিশ অফিসারটি বললে, 'স্যার, আপনি যে অসাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে এরকমভাবে ওদের ধরতে আমাদের সাহায্য করবেন...'

কাকাবাবু সে-কথা না-শুনে মিংমার দিকে ফিরে বললেন, 'কই রে, তৈরি হল না এখনও ? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। এখন ভাল করে এক কাপ চা খেতে চাই।'